

মুঢ়ের মেল

উত্তরণ ও অন্তরাল
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়



প্রবাদপ্রতিম মহানায়িকা সুচিত্রা সেনকে নিয়ে
প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লেখার দৃঢ়সাহসিকতা
কল্পনা ও বাস্তব তথ্যের সংশ্লেষ ঘটালেন রঞ্জন
বন্দ্যোপাধ্যায়। এই উপন্যাস এক অনন্য
অভিনেত্রীর উত্তরণের কাহিনি। প্রবল
প্রতিকূলতা, নিঃসীম একাকিত্বের মধ্য দিয়ে
তিনি তিমির অভিসারিণী।

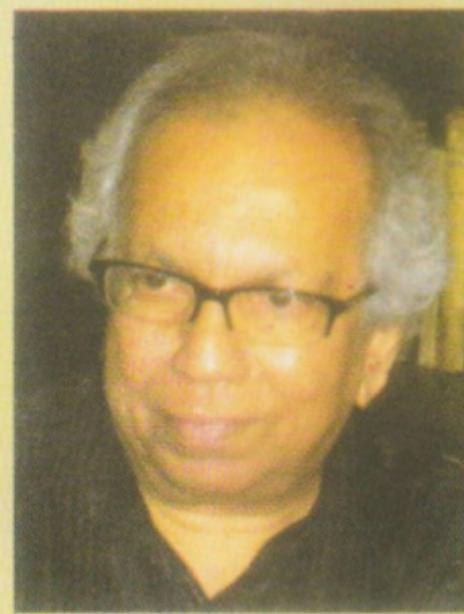
তাঁর একমাত্র আলো শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ। একদিন
রামকৃষ্ণই তাঁকে ধ্যানের মধ্যে বললেন, তোকে
মা-ই অনেক দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে পুড়িয়ে
নেবেন। দেখবি সেই নতুন বাটিতে আর
রসুনের গন্ধ নেই। তখন দেখবি এই জগৎ
থেকে তুই আলাদা হয়ে গেছিস। একা হয়ে
যাবি। লোকে ভাববে, এ কেমন জীবন! একা
থাকে কী করে! তখন তো আলো দেখেছিস।
থাকবি অন্য এক আনন্দের মধ্যে।

এই উপন্যাসের জীবন্ত চরিত্র উত্তমকুমার,
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ
রায়, এবং আরও অনেকে। কারও সঙ্গে
কোনও সম্পর্কে আটকে থাকেননি আঁধার-
অভিসারিকা, আলোক-সন্ধানী সুচিত্রা সেন।
২০১৪-এর ১৭ জানুয়ারি মহানায়িকা ইহলোক
ত্যাগ করেন।

প্রচন্দ :: সৈয়দ ইকবাল

www.syediqbal.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪১। কর্মজীবন শুরু হয় ক্ষটিশ চার্চ কলেজে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনায়। কিন্তু সৃজনের দুর্নিবার স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা অহর্নিশ যাকে উদ্বেল করেছে, তাঁর কাছে ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠল অ্যাকাডেমিক পরিবহের শৈত্য ও শৃঙ্খল।

দীর্ঘ ১৬ বছরের অধ্যাপনা ছেড়ে তাই আশির দশকে যোগ দিলেন সংবাদপত্রে। প্রথমে ‘আজকাল’ পত্রিকার সহ-সম্পাদক, পরে ‘আনন্দবাজার’ পত্রিকার সহ-সম্পাদকের দায়িত্বে। বর্তমানে ‘সংবাদ প্রতিদিন’ পত্রিকার সহ-সম্পাদক।

ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু বই। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার জন্য নানা-জগতে অনায়াস সঞ্চার তাঁকে প্রাণিত করেছে বিচিত্র বিষয়ের লেখায়। ফিচার প্রবন্ধ উপন্যাস। সেইসব আশ্চর্য রচনা একাধারে যেমন তাঁকে পৌছে দিয়েছে অন্য-উচ্চতায়, তেমনই সৃষ্টি করেছে নতুন বিতর্ক।

ভালোবাসেন পড়তে, আড়া দিতে, বেড়াতে এবং অবশ্যই লিখতে।

নবযুগ প্রকাশনী প্রকাশিত রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যান্য বই-কাদম্বরীদেবীর সুইসাইড নোট, রবি ও রাগুর আদরের দাগ এবং আদরের উপবাস রবীন্দ্রনাথ ও আমি রবি ঠাকুরের বউ।

সুচিত্রা সেন
উত্তরণ ও অন্তরাল

সুচিং সেন

উত্তরণ ও অন্তরাল

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

নবযুগ প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

◎
ঞ্চার

নবযুগ সংস্করণ : ফালুন ১৪২০, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

মূল্য : ১৮০.০০ টাকা

প্রকাশক : অশোক রায় নন্দী, নবযুগ প্রকাশনী, ৬৭ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ। মোবাইল : ০১৭১১-৫২১৯৯৮, ০১৯৪০-১১২৬৭২

মুদ্রক : আবির কম্পিউটার, ০১৭১০-৫৪৬৩০১, মুদ্রণ : নিউ এস. আর প্রিন্টার্স
বিদেশে প্রাপ্তিহান, লভনে : সঙ্গীতা, ২২ ব্রিকলেন, আমেরিকায় : বুক ডিউ
কানাডায় : এটিএন মেগা স্টোর, ভেনফোর্ড এভিনিউ, টরোন্টো, ভারতে : দেজ
পাবলিশিং, নয়া উদ্যোগ (কোলকাতা), সুবর্ণরেখা (শান্তিনিকেতন)।

অনলাইনে অথবা ফোনে : [রকমারি.com](http://www.amarbari.com), 01841115115.

বই 24.com, 01763665577

ISBN : 978-984-8858-88-2

দুনিয়ার পাঠক প্রক্ষেত্রে! [সৈয়দ ইকবাল](http://www.amarboi.com) ~ [Www.amarboi.com](http://www.amarboi.com) ~

উৎসর্গ

টুম্পাই সুজ্যয় বোস ও রূপাই-কে

ଓঁ শুভ্র মৃগ প্রেরণ অনুমতি!

କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ

କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ
କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ
କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ
dangerously handsome ! Safety can't go without him !

(iii) କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା



ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸੁਣੀ ਬੈਖ਼ੂਨੀ ਹੋ ਗਈ।
ਫਲੋ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ, 2-ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਹਾਂਥ ਵੱਡੇ ਦੁਆਰਾ
ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਆਉ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆਰਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚੋਂ 5-ਘੰਟੇ ਵੱਡੇ ਸੱਭਾਲੇ
ਗੁਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿਚੋਂ ਮੁਹੂਰਾ। ਇਹ ਸੱਭਾਲੇ
ਕਿਵੇਂ -

藏文

બાળ મનોરૂપી- સાહિત્ય અધ્યક્ષ-

ପାଦରେ ପାଦରେ ଯିହାକୁ ଚାଲିବା ଅଛେ ଏବାଳେ କାହାର
ନାହିଁ : ମେଣ୍ଡରେ ଆଜିଲୁଙ୍କ ଦୂରରେ ମର ଯାଏଗା
ତୁମ୍ଭଙ୍କ ବାଜାରେ ଚାଲିବାର ମାଧ୍ୟମ ହୁଏ କିମ୍ବାର
ନିଷ୍ଠା ଥାଏଇଁ : କିମ୍ବା କିମ୍ବା ରହା ହେଉ ଯାଏଇଁ :
କିମ୍ବା ଖାଇଁ ଏ ଖାଇଁ କିମ୍ବା ଖାଇଁ କିମ୍ବା
କିମ୍ବା ? କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା ? କିମ୍ବା କିମ୍ବା ?
କିମ୍ବା କିମ୍ବା ? କିମ୍ବା କିମ୍ବା ? କିମ୍ବା କିମ୍ବା ?
କିମ୍ବା କିମ୍ବା ? କିମ୍ବା କିମ୍ବା ? କିମ୍ବା କିମ୍ବା ?
କିମ୍ବା କିମ୍ବା ? କିମ୍ବା କିମ୍ବା ? କିମ୍ବା କିମ୍ବା ?
କିମ୍ବା କିମ୍ବା ? କିମ୍ବା କିମ୍ବା ? କିମ୍ବା କିମ୍ବା ?
କିମ୍ବା କିମ୍ବା ? କିମ୍ବା କିମ୍ବା ? କିମ୍ବା କିମ୍ବା ?
କିମ୍ବା କିମ୍ବା ? କିମ୍ବା କିମ୍ବା ? କିମ୍ବା କିମ୍ବା ?
କିମ୍ବା କିମ୍ବା ? କିମ୍ବା କିମ୍ବା ? କିମ୍ବା କିମ୍ବା ?
— କିମ୍ବା କିମ୍ବା ? କିମ୍ବା କିମ୍ବା ? କିମ୍ବା ?

କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ - ସବୁମାତ୍ର କାହିଁ କାହିଁ । ପରିମଳ
କାହିଁ । କାହିଁ କାହିଁ
କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ । କାହିଁ କାହିଁ
କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ । କାହିଁ କାହିଁ
କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ କାହିଁ ।

ତେଣୁ ବା କଲ୍ପନା ଓ କରୁଥିଲା କହିଛା । କୀ କାହିଁବୀର ତେଣୁ ?
କୀ କାହିଁବୀର କିମ୍ବା କିମ୍ବା କାହିଁବୀର କାହିଁବୀର କାହିଁବୀର
କାହିଁବୀର କାହିଁବୀର - କାହିଁବୀର କାହିଁବୀର କାହିଁବୀର
କାହିଁବୀର -

କୁଟୁମ୍ବା କାହିଁବୀର କାହିଁବୀର କାହିଁବୀର ; କାହିଁବୀର
କାହିଁବୀର କାହିଁବୀର କାହିଁବୀର କାହିଁବୀର ।

- କୁଟୁମ୍ବା, କାହିଁବୀର କାହିଁବୀର କାହିଁବୀର କାହିଁବୀର ।
କାହିଁବୀର କାହିଁବୀର କାହିଁବୀର କାହିଁବୀର ।

- କାହା ! କାହା ! କାହା !

- କାହା କାହା କାହା କାହା ? କାହା (କାହାକୁ) କାହା ?
କାହା କାହା କାହା କାହା ? କାହା କାହା ? କାହା ?
କାହା କାହା ? କାହା କାହା ? କାହା (କାହାକୁ) , କାହା ?
କାହା ? କାହା ? କାହା ? କାହା ? କାହା ?
କାହା ? କାହା ? କାହା ? କାହା ? କାହା ?
କାହା ? କାହା ? କାହା ? କାହା ? କାହା ?
କାହା ? କାହା ? କାହା ? କାହା ? କାହା ?
କାହା ? କାହା ? କାହା ? କାହା ? କାହା ?
କାହା ? କାହା ? କାହା ? କାହା ?

- କୀ କାହା ? କାହାକୁ କାହାକୁ କାହା ?

- କୁଟୁମ୍ବା କାହା ? କାହାକୁ କାହାକୁ କାହା ?
କାହାକୁ କାହାକୁ କାହାକୁ କାହା ? କାହାକୁ
(କାହାକୁ) କାହାକୁ କାହା ? କୁଟୁମ୍ବା କାହାକୁ
କାହାକୁ କାହା ? କାହା ? କାହା ?
କାହା ? କାହା ?

କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା
କିମ୍ବା ? କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା ?
କିମ୍ବା କିମ୍ବା ? କିମ୍ବା କିମ୍ବା ? କିମ୍ବା ?
କିମ୍ବା ? - କିମ୍ବା ? କିମ୍ବା ? କିମ୍ବା ?

藏文大藏经



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৩১-এর ৬ এপ্রিল।

পাটনায় মামার বাড়িতে যে-মেয়ে জন্মাল, তার নাম রাখা হল কৃষ্ণ।

করুণাময় আর ইন্দিরা দাশগুপ্তর মেজো মেয়ে। ভাবি মিষ্টি। চাঁদপনা মুখ। হাসলে হাসি দেখে প্রাণ জুড়ায়। কিন্তু গায়ের রং আটপৌরে। তা-ই কৃষ্ণ।

বড় বোনের রং অতটা চাপা নয়। তাকেও বেশি দেখতে। নাম উমা। বাড়ির ছেলেমেয়েদের নামের ব্যাপারে অবিশ্যি বাড়ির কর্তা, করুণাময়ের পিতৃদেব জগবন্ধু দাশগুপ্তর কুচি ও অনুমোদনের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। তিনিই তো মধ্যবিত্ত দাশগুপ্ত পরিবারের ‘হেড-অফিস’।

ভাইবোন মিলে কৃষ্ণারা জন্মেই ন'জন। যাকে বলে করুণাময়-ইন্দিরার জমজমাট সংসার। চার ভাই : নিতাই, নিমাই, পঁগৌর, গৌতম। পাঁচ বোন : উমা, কৃষ্ণা, হেনা, লীনা, কুন্না।

ঠাকুর্দা জগবন্ধু দাশগুপ্তর পছন্দেই এই সব সাবেকি নাম। কৃষ্ণার বাবা করুণাময় সাধারণ সরকারি কর্মচারী। নয় সন্তান আর স্ত্রী ইন্দিরাকে নিয়ে মধ্যবিত্ত সংসার।

তফাত একটি জায়গায়। ইন্দিরা চোখে পড়ার মতো সুশ্রী। এমন চটকদার ঘরের বউ গেরস্তর সংসারে চট করে দেখা যায় না। বটকে নিয়ে করুণাময়ের মনে স্বাভাবিক অহংকার। মেজো মেয়ে কৃষ্ণাও যে মায়ের মতোই সুন্দরী হতে চলেছে, সে-বিষয়ে করুণাময় জন্মেই নিশ্চিত।

পিতৃদেব জগবন্ধুর শরণাপন্ন না হয়ে কৃষ্ণার আরও একটি নাম রাখলেন করুণাময়: রমা। কৃষ্ণা একটু বড় হতে রমা নামেই তাকে সবাই চিনল। এই নামে তিন অর্থের রং আছে মিশে: দেবী লক্ষ্মী, সুদর্শনা, প্রিয়া। যে-মেয়েকে দেখলেই মনের মধ্যে বেজে ওঠে আরাত্রিক, জেগে ওঠে প্রেম, সে-ই তো রমা। কৃষ্ণা ক্রমশ ঝারে গেল। দেখা দিল রমা, পুরুষের মুক্তার্জনে অবিতীয়া, মেয়েদের ঈর্ষা-অর্জনে অনন্য।

কৃষ্ণা তো মেজো বোন। তার ভাইবোনেরা কেমন? কৃষ্ণা কি ওদেরই মতো? না, ছোটবেলা থেকেই অন্য রকম? বড় বোন উমা কৃষ্ণার মতো অমন ছিপছিপে নয়। তবে গায়ের রঙে কৃষ্ণাকে হারিয়ে দিয়েছে। হলে কী হবে, দু-বোন পাশাপাশি থাকলে কৃষ্ণার দিকেই নজর যায়। উমা হয়তো সুন্দরী, কিন্তু কৃষ্ণা চটকদার। উমা ভালবাসে সাজগোজ। কৃষ্ণা স্বাভাবিক, ছটফটে, হাসলে একশোতে একশো। কৃষ্ণার পরের বোন হেনা একেবারেই অন্য রকম, যাকে বলে সাবেকি বাঙালি সুন্দরী, রং বেশ ফর্সা, গড়নে নধর, নরম। তার মধ্যে নেই কৃষ্ণার ছিপছিপেমি, চাটুল্য, উথলে-পড়া ভাব। কৃষ্ণার বেশি ভাব লীনার সঙ্গে। লীনা হেনার পরের বোন। তারও গায়ের রং শ্যামল। তারও শরীরের গঠনে এতটুকু মেদ নেই। এবং তারও স্বভাবে আলতো-দুষ্টুমি। জলকুমির বা চোর-চোর খেলায় লীনাই কৃষ্ণার সঙ্গী। প্রাণে খুশি জাগলে সুরে-বেসুরে তারা এক সঙ্গে গলা মিলিয়ে গানও গায়। সুর আছে বটে পরের বোন রুনার গলায়। রবীন্দ্রসংগীতের পক্ষে মানানসই গলা। তবে বোনেদের বায়না মেটাতে রুনা বাংলা বা হিন্দি সিনেমার হিট গানও করে।

কৃষ্ণা দিনের অনেকটা সময় কঁটাইয়ে তার তিন পিসির সঙ্গে। বিয়ে হয়নি তিন পিসির। কমলা, কুষ্টী, কমলা-কৃষ্ণার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়। তবু পিসিদের সঙ্গে কৃষ্ণার এমন্ত্র-একটা চাপা বন্ধুত্ব, যার নাগাল পায় না অন্য বোনেরা।

বড়দা নিতাইয়ের সঙ্গে কৃষ্ণার বড় ভাব। কৃষ্ণা যাই করুক, নিতাইয়ের তাতে অন্ধ সমর্থন। দাদা-বোনের বাগড়া কেউ কখনও দেখেনি। কৃষ্ণার মধ্যে যে স্বাভাবিক দুষ্টুমির খেলাটা তাকে দিনে-দিনে আরও আকর্ষণীয় করে তুলছে, তার সামনে নিতাইয়ের সবুজ সংকেতও সর্বদা জুলছে। নিতাইয়ের গো-অ্যাহেড আছে বলেই তো কৃষ্ণার হিলহিলে চাপল্য। মেজো নিমাই কিন্তু কৃষ্ণাকে ততটা আশকারা দেয় না। তার সঙ্গে ভাব বেশি উমার। তবে তাতে কিছু যায় আসে না কৃষ্ণার। নিতাইয়ের সাপোর্টই যথেষ্ট। সেজো ভাই গৌর আর ছোট ভাই গৌতম কৃষ্ণার খেলার সাথি। গৌতমকে দেখতে দারণ। কৃষ্ণা আর গৌতম নেমতন্ত্ব বাড়িতে এক সঙ্গে গেলে আলাদা রোশনাই। যেন তারা রূপকথার ভাইবোন।

ছোটবেলা থেকেই নাচতে ভালবাসে কৃষ্ণা। রেডিয়োতে গান হলে হাত ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সুরে-ছন্দে সে ভাসিয়ে দেয় তার ছোট্ট শরীর। নাচতে-‘নাচতে গানও করে। কৃষ্ণার নাচ দেখে ভাইবোনেদের কেউ টিপ্পনী কাটলে

ধরকে দেয় বড়দা নিতাই। নিতাই বরদাস্ত করে না কৃষ্ণার কোনও সমালোচনা। মানুষকে নকল করতে ভালবাসে কৃষ্ণ। নকল করার এক আশ্চর্য স্বাভাবিক ক্ষমতা। কৃষ্ণ বকুনি খেলে নিতাই বলে, কৃষ্ণ কিন্তু একদিন খুব বড় অভিনেত্রী হবে। কৃষ্ণ হবে অভিনেত্রী! হেসে উড়িয়ে দেয় পিসিরা। কৃষ্ণকে সব ব্যাপারে সমর্থন করার জন্য নিতাইকে হতে হয় ঠাট্টার পাত্র।

এই যে নেচে-গেয়ে-খেলা করে কাটছিল কৃষ্ণার বালিকাবেলা, তা কিন্তু পাটনায় নয়। বাংলাদেশের পাবনায়। কৃষ্ণার বাবা সরকারি চাকুরে কর্মণা দাশগুপ্ত মেয়ের জন্মের কিছুদিন পরেই চাকরিস্থে চলে এসেছেন পাবনায়। সেখানেই বড় হচ্ছে কৃষ্ণ। ছোট একতলা বাড়িতে থাকে দাশগুপ্ত পরিবার। পাবনার মাঠের ধারে এই সুদর্শন ছিমছাম বাড়ি। কৃষ্ণ ভর্তি হয়েছে পাবনা গার্লস হাইস্কুলে। সেখানে সে পেয়েছে তার নতুন বন্ধুদের—ফুলরানি, রেখা, বাসন্তী, কণা, রেবা, শিপ্রা, মলয়া, প্রতিভা, মণ্জুশ্রী (যিনি পরে ডাঙাস গিল্ডের প্রতিষ্ঠাতা মণ্জুশ্রী চাকী)। কৃষ্ণ অবিশ্বিএক অর্থে যশোরের মেয়ে। ওদের আদিবাস সেখানেই। কিন্তু পাটনায় আমার বাড়ি ছেড়ে আসার পর কৃষ্ণার সব দিক থেকে বড় হয়ে উঠে প্রক্ষেত্রে।

পদ্মা আর ইছামতী, পাবনার হৃষী নদী। বর্ষায় তাদের আলাদা করে চেনা শক্ত। শীতে দুই নদীর পৃথক চর। পদ্মা আর ইছামতী লুকনো স্বভাবের, চোরা স্ন্যাতের নদী। কখনও পাড় ভাঙ। কখনও শান্ত। কৃষ্ণ নদীর কল্যা। তার মধ্যে দুই নদীর স্বভাব, চরিত্র, রোমান্টিক দৃতালি। কলকাতার শিয়ালদা স্টেশন থেকে ছাড়ে পাবনার ট্রেন। পাবনার নিজস্ব কোনও রেল স্টেশন নেই। আসাম মেলে পৌছতে হয় ইশ্বরদি স্টেশনে। সেখান থেকে ঘন্টাখানেকের মনোরম বাসপথে পাবনা। কৃষ্ণার বালিকাবেলার পাবনা, ছোট সুন্দর শহর। কংক্রিটের জঙ্গল নয়, গাছপালায় স্বিঞ্চ ছায়াময় জনপদ। বর্ষায়-শরতে-বসন্তে-শীতে দুই নদীর ভিন্ন-ভিন্ন রূপ। শীতকালে পদ্মা বা ইছামতীর শুকিয়ে যাওয়া শূন্য চরে বিকেলের আলোয় কৃষ্ণ জলকুমির খেলে বন্ধুদের সঙ্গে। হঠাৎ সে খেলা থামিয়ে সরে যায় নিজের সঙ্গে একা হতে। কুষ্টিয়া আর শিলাইদহ যাওয়ার স্টিমার চলে ইছামতীতে। কৃষ্ণ খেলা থেকে সরে গিয়ে সেই দিকে তাকিয়ে একা বসে থাকে চরের উপর। কখনও পায়ে হেঁটে ইছামতীর শুকনো চরে চলে যায় অনেক দূরে। যদি ফেটে যায় বালির চর, ভিতর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে নদী! এই ভয়ে বন্ধুদের মতো আটকে থাকে না সে। সে যে অন্য রকম,

ধরা পড়ে সেটা জলকুমির খেলাতেও। তার মেদিবিহীন গতির সঙ্গে এঁটে ওঠা সহজ নয়। তার শরীর তার স্বভাবের মতোই। ধরাছোয়ার বাইরে। কিন্তু ধরা পড়লে সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে পারে না। কেন্দে ফেলে। তাঁর কোমল শরীরে তত শক্তি নেই যত আছে তার মনে। বসন্ত-শরৎ-শীতের দুপুরে সে নিজের সঙ্গে একা হতে পারে। বিচ্ছিন্নতাবোধ তার স্বভাবের অঙ্গ, সেটা বোঝা যায় সে যখন পলিটেকনিকের মাঠে একা ঘুরে বেড়ায়। কিংবা ভিড়ের মধ্যেও একা মেয়ে হাঁটে পাথরতলা বাজারের রাস্তায়। কখনও-কখনও বিরাট কম্পাউন্ডের মধ্যে জজসাহেবের রাঙা ব্রিটিশ বাংলোর দিকে তাকিয়ে বসে থাকে ঝুরিছড়ানো বটগাছের ছায়ায়। হয়তো স্পন্দন দেখে, একদিন এই শহরের ছেট গান্ধিটার বাইরে অন্য কোথাও অন্য কিছু হওয়ার। ওই লালরঙের বাংলো বাড়িটা তাকে ডাক দেয় অন্য কিছু হয়ে ওঠার ভবিষ্যতের দিকে। বন্ধুরা তখন এ-মেয়েকে চেনে না। তারা দূরে সরে থাকে। তার মধ্যে যেন লুকিয়ে আছে কোনও রহস্যময় দূরবর্তিতা, কোনও দুষ্প্রাপ্যের শ্রীরাধা, যার প্রকাশ ও অন্তরাল একাকার দূরাত্ম পেরিয়ে। রাধাই তো সেই মেয়ে যে নিজের ছায়ার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল আয়ান ঘোষের, নিজের শরীরের ওপর টেনেছিল কৃষ্ণের আড়াল-সে-শরীর শুধু কৃষ্ণের। রাধার ছায়ার সঙ্গে ঘর করেছিল আয়ান দীর্ঘ চোদ্দো বছর। অন্তরালের ছলনা সে ধরতে পারেনি। মৃলে-মনে ভাবে কৃষ্ণার বন্ধুরা, ওর বর কি ওকে বুঝতে পারবে? এ-মেয়ে কি কারও কাছে কোনও দিন ধরা দেবে?

বন্ধুদের সঙ্গ সব সময় ভাল লাগে না কৃষ্ণার। মাঝে-মধ্যে মনে হয়, সে ওদের কেউ নয়। তার নেই কোনও আঘায়, নেই কোনও বন্ধন। সে আকাশের। তার বন্ধুরা, রেবা, কণা, মণি, শিশা, মলয়া-ওদের মধ্যে কিছু একটা নেই, যা তার আছে। এই ‘কিছু একটা-টা’ ঠিক কী, সে ঠাওর করতে পারে না। সে নিজেকে বোঝার চেষ্টা করে। নিজেকে বুঝতে গেলে নিজের সঙ্গে একা হওয়ার দরকার। তার একা হওয়ার একটি নির্ভুল ঠিকানা পুজোর সময় ইচ্ছামতীর চরে কাশের অরণ্য। যতদূর চোখ যায়, বাতাসে দোলে কাশফুলের চামর। পাবনার আগমনি গান গায় কাশফুলের বন, ইচ্ছামতীর তীরে। কাশের বনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হারিয়ে যেতে ভাল লাগে কৃষ্ণার। বন্ধুদের ডাকে সাড়া দেয় না। একা হওয়ার আরও এক প্রিয় জায়গা জামরুল্লের বাগান। কৃষ্ণা জামরুল্লবাগানে পায় নিঃসংতার সুবাস, যে-গন্ধ একা হতে বলে। তার বন্ধুরা পায় না এই গন্ধ। বিকেলের আলো

ম্বান হয়ে আসে জামরঞ্জবাগানে। কৃষ্ণার মনকেমন করে। কার জন্যে? সে জানলে তো জানবে। সে শুধু জানে, এ-মনকেমন ব্যক্তিগত। অন্তরালে লুকিয়ে রাখার। এ-সংসারে কেউ বুঝবে না এই মনকেমনের কথা। এই মধুর কষ্ট শুধুই তার।

কৃষ্ণাদের একতলা বাড়ি। তার অনেক বস্তুর বাড়ি তাদের বাড়ির থেকে বড়। কৃষ্ণা ভাবে, একদিন অনেক বড় একটা বাড়ি হবে তার, অন্য কোনও শহরে, অন্য কোনও নদীর ধারে। লালরঙের বাড়ি, ত্রিটিশ বাংলোর মতো বড়, মন্ত একটা বাগান ঘেরা ছায়াঘন শান্তির নীড়। কৃষ্ণাদের বাড়িটা যদিও ছেট, সবাই চেনে। চেনে তার জন্য। দিনে-দিনে সে যে হয়ে উঠছে আরও সুন্দরী। সে যখন পলিটেকনিকের উল্টোদিকের রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়াতে বেরোয়, বুঝতে পারে, চারধার থেকে অনেক চোখ তারই দিকে তাকিয়ে। সবার চোখের সামনে ঘটছে তার জন্মান্তর। ঘটছে তার দ্বিতীয় জন্ম। সে পেরিয়ে যাচ্ছে কৃষ্ণ নামের গও। হয়ে উঠেছে রমা। আক্ষরিত অর্থে, একই সঙ্গে সে ক্রমশ লঞ্চী, সুদর্শনা, প্রিয়া।

রমার বিয়ের আগে বিয়ে হল রমার মেয়ের। মঞ্জুশ্রীর ছেলের সঙ্গে। ক'দিন ধরেই চলছে রমা আবু মঞ্জুশ্রীর তুমুল কলহ। কে হবে মেয়ের মা আর কে ছেলের, এই নিয়ে ঝিঙড়া। ঝিঙড়া মিটল বস্তুবন্ধন আভীয়স্বজনের এই ছড়ান্ত সিন্ধান্তে যে রমা-ই মেয়ের মা। ছেলে মঞ্জুশ্রী। বিয়ের দিন সকাল থেকে হই-হই ব্যাপার। সাজ-সাজ রব। রমা সাজল লাল বেনারসিতে। মেয়ের বিয়ে বলে কথা। শাড়ি পরতেই রমা গেল বদলে। এ-মেয়ের রূপ আটকে রাখে চোখ।

বর এল তাকিয়ার পার্কিতে চড়ে। কনেপক্ষের ফুলরানি, বিউটি, হেনা, প্রতিমা ছুটে এল বর দেখতে। বরপক্ষে রমার ভাই নিতাই-নিমাই। তারা এসেছে বরের সঙ্গে। পুতুল বর-কনের বিয়েতে পাবনার পাড়া থই-থই। কিন্তু মেয়ের মা কোথায়? কোন অন্তরালে হঠাৎ নিখোঁজ রমা? পুতুলজামাইকে তো তার-ই বরণ করার কথা। রমার খোঁজ পড়ল। সবাইকে বেশ কিছুক্ষণ উদ্বেগে রেখে রমার আবির্ভাব ঘটল নাটকীয়ভাবে। নির্ভুল সময়জ্ঞান এই মেয়ের, সন্দেহ নেই। যেন যজ্ঞের আগুন আর ধোঁয়া থেকে বেরিয়ে আসা হঠাৎ যাজ্ঞসেনী, পরলে রক্তিম বেনারসি, কপালে সিদুরের টিপ, সিঁথিতে নতুন উত্তাস, ঘোমটা টেনে বরণ করল পুতুলজামাইকে। কী সুন্দরী শাশ্বতি! পুতুলজামাই ভাগ্যবান।

রমার প্রিয় পুজো, বাসন্তীপুজো। প্রিয় রাত, কালীপুজোর রাত। প্রিয় বাজি, বসন তুবড়ি। ১৯৪৫। রমা পঞ্চদশী। রাত কালীপুজোর। শহর পাবনা। কন্যা পাবনায় পেয়েছে ঝাঁক বঙ্গুনি। নতুন সখি রমার মধ্যে এরা সবাই খোঁজে চেনা মেয়েকে, নিজেদের একজনকে। পেয়েও পায় না। আড়াল সরে না। খোঁজও শেষ হয় না। পেঁয়াজের অন্তর অব্বের মতো, অন্তরাল সরাতে-সরাতে জল আসে চোখে। রমা কত কাছের। সত্যিই তো পাড়ার মেয়ে। পাবনার বিখ্যাত পলিটেকনিক ইনসিটিউটের মাঠটা পেরোলেই তো রমার ছেটি বাড়ি। রমার বাড়িটাও রমার-ই মতো, আড়াল ভালবাসে। বাড়িটা যেমন, রমাও তেমন, কাছে থেকেও কত দূরে। রমা ঘন্টার পর ঘন্টা ইছামতীর চরে কাশের অরণ্যে ইছা করে উদাস হতে পারে।

বসন তুবড়ি তৈরি করে রমার প্রিয় বঙ্গ ফুলরানি চৌধুরির দাদারা। কালীপুজোর রাতে রমা আসে ফুলরানির বাড়ি। বেশ রাত করে আসে, যখন দীপাবলির উৎসব পৌছয় আলো-ছায়ার অকাশ-অন্তরালের মায়াতুঙ্গে। রমার পরনে চুমকি বসানো কালো শৃঙ্খল। তার পথের দু-পাশে বসন তুবড়ির অলীক রোশন। দীপাবলির আলো-ছায়ায় ছিপছিপ করে তার আকর্ষণ। দেখা-না-দেখা উদয়াপত্তি হয় কালীপুজোর রাতে রমার আগমনে। অনেক বছর পরেও এই মেয়ে হাঁটবে এক তৈরি-করা কালীপুজোর কৃত্রিম রাতে, তুবড়ি আর রংমশালের আলোয় অবাস্তব সুন্দর ম্যাজিক-রিয়েল এক দীর্ঘ পথে, একটি বাংলা সিনেমার প্রাণিক সিকোয়েসে। সে-সিনেমার নাম ‘জীবনত্ত্বণা’। তখন অবিশ্য রমার নাম আর রমা নয়। ঘটে গেছে তার তৃতীয় জন্ম।

প্রাকাশের অন্তরাল কত সুন্দর হতে পারে, রমাকে দেখতে-দেখতে বোঝে পাবনার এক কিশোর কবি কালীপুজোর রাতে। রমার কাছে আসার জন্য, তার সঙ্গে সামান্য আলাপের জন্য কালীপুজোর মহাভোগ পরিবেশনে মধ্যরাতে কোমর বাঁধে কবি। কিন্তু কাছে এসে তার হাত কাঁপে, কথা আটকে যায়, কিছুই বালতি থেকে হাতায় ওঠে না মহাভোগ। কবির অবস্থা দেখে রমা হাসে সেই হাসি, যার আলো তৈরি করে আলোকবর্ষের দূরত্ব। রমা তাকায় কবির দিকে, পাথির নীড়ের মতো চোখ তুলে। অন্তত তা-ই মনে হয় কবির।

বাসন্তীপুজোর দিন রমা আসে বঙ্গ প্রতিভা প্রামাণিকের বাড়িতে পুজোর অনুষ্ঠানে। ধূপধূনের ধোয়া, ফুলচন্দনের সুবাস, শাখফন্টার শব্দ, তার মধ্যে

বাসন্তী রং সবুজপাড় শাঢ়িতে রমা বৃন্দাবনি সারং। সেই কমললতার হৃদয়কথা যেন মনে-মনে বুঝতে চায় পুজোবাড়ির মুঝ ভিড়। রমা সবার থেকে আলাদা, একা। সব দৃষ্টি তার দিকে। পাবনার কবিও এসেছে রমার টানে বাসন্তীপুজোর অনুষ্ঠানে। ইচ্ছে কাছে যাওয়ার, কথা বলার। কয়েক পাশেই পৌছনো যাবে বাসন্তী রঙের শাঢ়ির কাছে। কিন্তু সবুজপাড় বাসন্তী রং আলোর পানে তাকিয়ে কবির মনে আসে এক অমোঘ অনুভব, ‘মনে হয় এর চেয়ে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ভাল।’ এই অন্ধকার কি সরে যাবে দোলের দিন? রমাকে স্পর্শ করা যাবে আবির খেলার ছলে? দোলপূর্ণিমার আলোয় রমা সাজে রাধা। সে নাচে। রূপে রসে বিলাসে যেন সত্যিই বৈষণব পদাবলির শ্রীরাধিকা, যার ঢোকের আলো, ঠোঁটের আভাস, শরীরের ইশারা দূর করে অন্ধকার, বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।

‘মাত্র ক’ বছর পরে জয়দেবের এই শ্রীরাধিকাকে আমরা পাব ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছবির সুচিত্রা-বিষ্ণুপ্রিয়া। মেঁ বিষ্ণুপ্রিয়াই যেন রাধাবেশী রমার মধ্যে জায়মান। যে-নারীর রোমাঞ্চকর্তা তার দূরায়ত সহজতায়। যে-নারীর আভরণ তার অন্তরাল, কিন্তুতেই যার কাছে আড়াল পেরিয়ে পৌছনো যায় না। তাকে হেছে যাওয়ার মধ্যেই যেন তাকে পাওয়া যায়। এই কথাটাই চৈতন্যবেশী ক্লিন্ট চৌধুরি পৌছে দেন বিষ্ণুপ্রিয়া-সুচিত্রাকে ছবির অস্তিমে। আরও অনেক বছর পরে শিল্পী সুহাস রায় তাঁর রাধাচিত্রমালায় শ্রীরাধার এই রোম্যান্টিক আড়াল, দূরবর্তিকাকেই ধরতে চাইলেন স্মিত, প্রায় প্রচন্ন রংরেখার বিন্যাসে। কিন্তু আমরা বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করি, সুহাসের শ্রীরাধা ক্রমেই হয়ে উঠেছে রূপে-গঠনে-আদলে সুচিত্রা সেন, পাবনার রমারই মতো ছবছ, শুধু কয়েক বছরের বড়। সুচিত্রারই মতো এক নারীর সুদূরতা, রোম্যান্টিক নেপথ্যচারিতা, প্রচন্নতার সংশ্লেষ কী অসামান্য উপর্যাপনে উত্তীর্ণ সুহাস রায়ের রাধাচিত্রমালায়!

শ্রীরাধার সুচিত্রায়নের কথা যখন উঠলাই, উপন্যাসের আপাত ব্যাকরণ ভেঙে, রমার গল্প থেকে কিছুক্ষণ বেরিয়ে গিয়ে ওই প্রসঙ্গে আরও দু-চার কথা এখানে লেখা যেতে পারে। কারণ, সুচিত্রা সেনের রূপ ও খ্যাতির ব্যাপ্তি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে রমার রাধাসুচিত্রা হয়ে ওঠার গল্পের সঙ্গে।

কেমন দেখতে ছিল শ্রীরাধাকে? এ-প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যাপতির বর্ণনা :

জঁহা জঁহা ঝলকত অঙ্গ
তঁহি তঁহি বিজুরি তরঙ্গ ।

রাধা সবে শ্বান করেছে যমুনায়। তার শরীর ঝিলিয়ে উঠেছে। কি হেরেলুঁ
অপূর্ণ গোরি, পইঠল হিয়া মাহ মোরি। এ-মেয়ে যখন যমুনার ঘাট থেকে
নিঃশব্দ চরণে উপরে উঠে আসে, পায়ে-পায়ে ফুটে ওঠে পদ্মফুল: জঁহা জঁহা
পদযুগ ধরই, তঁহি তঁহি সরোরহ ভরই। মেয়ের বয়েস অল্প। ধনী অলপ
বয়সী বালা, জনু গাঁথনি পুহুপ মালা। কিশোরী যেন গাঁথা ফুলের মালা।
কেমন এ-মেয়ের শরীরের মাপজোক? কেসরি জিনিয়া মাঝাইঁ খান, কন্যার
কটিদেশ সিংহের কোমরকে হার মানায়। কিশোরীর বুক সম্পর্কে কতবার
কতভাবে বলেছেন বিদ্যাপতি: পীন পয়োধর রোচি উজোরি/শ্রীফল ফলিনী
কনক মজোরি। উজ্জ্বল দুটি স্তনের দিকে তাকালে বেল ফলের কথা মনে
আসে। এ-কথা বলেই জিভ কাটছেন বিদ্যাপতি, বলছেন, বেল নয় বেল
নয়, কনকবর্ণ কাননমঞ্জরী। শরীরে আবরণের লোভনীয় লীলায় কতখানি
চতুর ছিলেন রাধা? বিদ্যাপতির বর্ণনা :

আধ নুকায়লি আশা উদাস
কুচকুস্ত কহি মেঝে অপনক আস ॥

রাধা কখনও তার স্তনচূড়াত আদেক লুকিয়ে রাখে। কখনও আদেক
উদাস। কেন এমন করে রাধা? কুচকুস্ত কহি নেল অপনক আস। স্তন দুটি,
একটি কিছুটা ঢাকা, অন্যটি সম্পূর্ণ ‘উদাস’, শুধুমাত্র প্রকাশ করে তাদের
'আশা'। কীসের আশা? কৃষ্ণের স্পর্শের আশা? বিদ্যাপতি ইচ্ছে করে
আবছা থাকেন এই জায়গাটায়।

এবার রাধার বুকশ্রী থেকে মুখশ্রীতে। মুখের দিকে তাকালে, সে-মুখের
কথা ভাবলে কী মনে হয় আমাদের?

তাহে অধিক মুখমণ্ডল গোরা।
পুনসিক টাঁদ কিয়ে করিল উজোরা ॥

রাধার মুখ ভাবলে মনে জেগে ওঠে পূর্ণ পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। সেই
আনন্দজ্যোৎস্না চারধারে বিছিয়ে দেয় আলোর বিতান, আবেদনের চন্দ্রাতপ।
জাগায় কামনা :

ময়ু মনে মনমথ রাখলি গোরি।
বিছরিতে চাহি নহি হোয়ে বিছরি ॥

সেই মুখ মনের মধ্যে রেখে যায় মন্ত্রকে (কামদেবকে)। ভুলতে চাই (বিছরিতে চাহি), পারি না ভুলতে (নহি হোয়ে বিছরি)।

কেন আমাদের পাগল করে রাধার মুখ? ঠিক কোথায় সে-মুখের ঘোন আবেদন? জানেন বিদ্যাপতি :

বয়ন উজোর তহি নয়ন সানন্দ।
নীল নলিনী দউ পূজল চন্দ।॥

রাধার আনন্দ-সন্ধি দৃষ্টিতেই রয়েছে ঘোনসংরাগ। কেমন আনন্দ? নীলপদ্ম দিয়ে যেন চাঁদকে দিছে অর্ঘ্য।

এত কথা বলার পর বিদ্যাপতি যেন মুক্তি হেসেই বলছেন, রাধার চূড়ান্ত আবেদন কিন্তু তার চোখে নয়, শনে নয়, কোমরে নয়, গাঁথা ফুলের মালার মতো শরীরে নয়, সে-আবেদন রাধার অন্তরালময়তায় :

একলি চললি ধনি হোই আগুয়ান।
উমড়ি কহই সবি করহ পুজন॥
কিএ ধনি রাগি বিরামিলি হোয়।
আস নিরাস দগধুক্তি মোয়॥

প্রাচীন এই বরনারীকে সম্মতিলাভ স্বপ্নে ফিরিয়ে আনতে শিল্পী সুহাস রায় ঝঁকেছেন এমন এক শ্রীরাধিকার ছবি, যিনি সুচিত্রা সেন। শ্রীরাধিকার এই সুচিত্রায়ন সুচিত্রা সেনের বিরল তনুশীল প্রতি তন্ত্রিষ্ঠ তসলিম। কখনও তাঁর রাধাসুচিত্রার বস্তিচেন্দ্রির ধ্যানাশ্রিত। কখনও বা ভিনাস-এর ইশারাময় প্রকাশ রাধাসুচিত্রার শরীর-উচ্চারণে। কখনও রাধাসুচিত্রার জপল্লবে, ঠোটে, চোখে দা ভিপ্পির অন্তরাল। কখনও আবার সুহাসের রাধাসুচিত্রা বিপ্রকীর্ণ বিদ্যাপতি :

কামিনি করএ সনানে।
হেরিতহি হনয়ে হনএ পাঁচবানে॥
চিকুর গলএ জলধারা।
জনু সুখসনি ভরে রোএ অঁধারা॥
কুচজগ চারং চকেরা।
নিগ কুল মিলিত আনি কোন দেবা॥
তেঁ শঙ্কা এ ভুজপাসে।
বাঁধি ধএল উড়ি জাএত অকাসে॥
তিতল বসন তনু লাগ।
মুনিষ্ক মানস মনমথ জাগ॥

রমণী অপূর্বা। রাধাসুচিত্রার কেশরাশি অন্ধকার, তার মুখ চাঁদের আলো, তার নয়ন পদ্ম। আঁধারে ঘটছে চাঁদ আর পদ্মের সহবাস। সেদিকে তাকালে লুক পুরুষমনের চালক হয়ে ওঠেন কামদেব। রাধাসুচিত্রার স্তনশোভা যেন কনকলতার ফল। শ্রীরাধার আবেদন বর্ণনায় বিদ্যাপতি যত মিতবাক, ঠিক ততটাই অঙ্গুট সুহাস তাঁর রাধাসুচিত্রার রূপায়ণে। বিদ্যাপতির রাধার মতোই তাঁর রাধাসুচিত্রা কখনও বৃত্ত, কখনও অনবৃত্ত। কখনও আশ্রম্ভব্যাঘ, কখনও আদিম সহজতায় উন্নীল। এ-নারীর উরুযুগল স্বর্ণকদলীর ন্যায়। তার উপর মৃদু আনন্দলনে মায়াময় সিংহকটি। রাধার স্তনবৃত্ত যেন খেত মেরুপর্বতের শীর্ষে দুটি কমল। কোমরে তার কামদীণ ত্রিবলিতট, দুর্নিবার তিনটি খোঁজ। শ্রীরাধিকার রূপ বর্ণনায় বিদ্যাপতি হয়ে উঠছেন ক্রমেই আরও বেশি সাহসী এবং স্পষ্ট, প্রায় ফটোগ্রাফিক; রাধার কামদীণ ত্রিবলিতটের পাশে গভীর তরঙ্গিণী তীর। যে-তটের কাছে জল ছাড়াই জন্মেছে শৈবাল (জন্ম সেমার লতা বিনু নীর)। রাধার সুখের স্বাভাবিক উত্তাসকে মাঝে-মাঝে পরাজিত করে তার অন্ধকার খোঁপা (ধম্পিল)। রাধার স্তনপদ্ম যে শুকিয়ে যাবলো তার কারণ তার বুকের হারের সুরতরঙ্গিণী। তার সারঙ্গ নয়নে খেলা করে কামনা। তার দুটি ভুক্ত যেন বাসনার ধনু। রাধার বুক প্রায় সব সময়েই অর্ধেক খোলা, অর্ধেক ঢাকা (আধ উরজ হেরি আধ আঁচন্দ্রুরি)। বারবার হাওয়ায় উড়ে যায় তার আলগা আঁচল। প্রকাশিত হয় আংশিক উরজ। তার কাঁচলি যেন স্বয়ং কামদেব। তার বুকের হার যেন কামদেবের ফাঁস। সুহাসের আঁকা রাধাসুচিত্রায় ফুটে উঠেছে বিদ্যাপতি-বর্ণিত রূপরেখারস। এ-মেয়েকে যতই দেখা যাক, দেখার আশ মেটে না। রাধার রূপবর্ণনায় বিদ্যাপতি ‘সারঙ্গ’ শব্দটিকে কখনও ব্যবহার করেছেন ‘হরিণ’ অর্থে, কখনও ‘কোকিল’ অর্থে, কখনও ‘কামদেব’ অর্থে, কখনও ‘পদ্ম’, ‘ভ্রমর’, ‘কেশ’ অর্থে। তাঁর আঁকা রাধার চোখেও কখনও হরিণের চাঞ্চল্য, কখনও ভ্রমরের বার্তা, কখনও কোকিলের কুহক, কখনও সে-চোখে পদ্মের পাপড়ি, কখনও কামদেবের কটাক্ষ। বিদ্যাপতির ‘সারঙ্গ’ শব্দটিকে সর্বার্থে মনে রেখেছেন শিল্পী শ্রীরাধিকার সুচিত্রায়নে।

সুহাস রায়ের রাধাসুচিত্রার উপর সন্দেহাতীত প্রভাব পড়েছে দেবকী বসু পরিচালিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছবির বিষ্ণুপ্রিয়া-সুচিত্রা। এ-ছবির সুচিত্রা একই অঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া এবং রাধা। উঠে এসেছেন বিদ্যাপতির কাব্য থেকে। অপরূপ দেখিআ জুবতি অবতার, এক অপরূপ যুবতী মর্ত্যভূমিতে

অবতীর্ণা, যার চোখ দুটি খঙ্গন পাখির মতো সর্বদা চঞ্চল, চহকি চহকি দুই খঙ্গন খেল। যে-নারীর পায়ে-পায়ে ফুটে ওঠে চাঁপাফুল, চম্পকে কএল, পুহুবি নিরমান। যে-নারী হাসলে (চৈতন্যের দিকে তাকিয়ে) মনে হয় দাঁত যেন ডালিমবীজের সারি, অধর বিষ সম দসন দাঢ়িমবিজু। যে-নারীর ভুঁড় দুটি যেন কামের কামান, কাম কামান চান্দ উগি গেল। যে-নারীর চোখের জলে অঙ্গরাগ ভেসে গেলেও যার সহজাত মাধুরী বিস্থল করে। দেবকী বসুর ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-র সুচিত্রা সেনকে দেখে মনে হয়, এ-মেয়ে ফুরাবেন না কোনওদিন। রহস্য ও আবেদন তাঁর চিরায়ত। তিনি আমাদের শৃঙ্খলার বারান্দায় প্রণয়নী হয়ে থাকবেন চিরকাল। সুহাসের শ্রীরাধার সুচিত্রায়নে এই নারীই রঙে-রেখায়-রূপকল্পে প্রতিভাত। চিরদিনের শ্রীরাধা। চিরকালের সুচিত্রা। দুই যুবতীর অপূর্ব আবেদন যেন নিরস্তর রোমান্সের দ্রৌপদীশাঙ্গি।

এই শিল্পীর রাধা-সিরিজের একটি ছবিতে সবুজ লতার মধ্যে ফুলের মতো ফুটে উঠেছে সুচিত্রার বিষণ্ণ মুখ। ক্ষেত্রে হাতীতভাবে সুচিত্রা সেন, সমস্ত অনুষঙ্গ, ইশারা, সংকেত, হলমক্কুসমেত। রাধাসুচিত্রার চোখে শুধু বিত্ত বিষণ্ণতা, যা অতিক্রম করেছে ঐহিকতার সীমাবদ্ধতা। এই সীমাত্তিক্রান্ত নির্জেয় বিষাদ, বিছেদযন্ত্রণা, আর্তি, প্রণয়, অর্পণ, সব উঠে এসেছে বৈষ্ণব পদাবলির প্রাণ্যাগাথা থেকে। সুহাসের শ্রীরাধার আধুনিক প্রসার ঘটেছে সুচিত্রার রূপকল্পে। সুহাস আঁকতে চেয়েছেন বিদ্যাপতিবর্ণিত ললিত তনু। এঁকেছেন সুচিত্রা সেনকে। রাধাসুচিত্রা চিরদিনের নবীনা রমণী, যার চোখে প্রেমরস, শরীরে রত্নতরঙ্গ, আলিঙ্গন অনুরাগ, অথচ যার মাধুর্যে প্রতত বিষাদ। শ্রীরাধিকার সুচিত্রায়নে ভবছ যেন বিদ্যাপতির রাধিকাকেই কাব্য থেকে ছবিতে তুলে এনেছেন সুহাস।

সুচিত্রা সেনেরই চোখ-নাক-ঠোঁট-ভুক, এমনকী সিঁথিটুকুও এঁকেছেন তিনি। ন্ম্র প্যাস্টেলে আঁকা রাধিকা-সুচিত্রা। অলৌকিক শ্রীরাধার ছবি অনেক দেখেছি। এমন লৌকিক, চেনা শ্রীরাধার ছবি আর দেখিনি। মৃদু প্যাস্টেলে সুচিত্রা-চাউনির আর্দ্রতাকে অবিকল বিদ্যাপতিবিন্যাসে ফুটিয়েছেন সুহাস। রাধাসুচিত্রার কপালে প্রসন্ন হিরণ্যয়তা, তাও উঠে এসেছে বিদ্যাপতির ললিত বিভঙ্গে। চারকোলেও এঁকেছেন তিনি রাধাসুচিত্রাকে। কোনও রং নেই। অপূর্ব বণহীন ছলছলানি। বিদ্যাপতি যেন স্বয়ং মিশিয়ে দিয়েছেন তাঁর রাধাকল্পনা এই শিল্পীর রাধাসুচিত্রায়। সুচিত্রা সেনের পলাতক প্রতিভাস সুহাসের চারকোল রাধায়। ডালপালা-পাতার কুঞ্জবন-আড়ালে

চেকে দিয়েছেন রাধার চারকোল নগ্নতা। ছবিটি দেখলেই মনে পড়ে বিদ্যাপতি।

জঁহা জঁহা নয়ন বিকাস।
 তহাঁই কমল পরকাস ॥
 জঁহা জঁহা হাস সঞ্চার।
 তঁহি তঁহি অমিয় বিথার ॥
 জঁহা জঁহা কুটিল কটাখ।
 ততহি মদন সর লাখ ॥
 হেরইত সে ধনি থোর।
 অব তিন ভুবন অগোর ॥

অপূর্ব এই রমণী। যেখানে ঘটে তার দৃষ্টিপাত, সেখানে ফোটে পদ্ম। যেখানে-যেখানে পড়ে তার হাসির দুতি, সেখানে বিস্তৃত হয় অমিয়। যেখানে সে হানে তার কটাক্ষ, সেখানে বহিষ্ঠ হয় লক্ষ মদনশর। সুহাস এঁকেছেন এমনই এক রাধাসুচিত্রাকে, যাকে দেখলে দৃঢ়খ ঘোচে, পুনু কিএ দরসন পাব/তব মোহে ইহ দুখ জাব।

এখন গোধুলি। মেয়েটি বড় নবীনা। সে ঘরের বাইরে। সে একা। আকাশে অঙ্গোনুখ রবির পাঞ্জাব আলো। নবীনার তনুদেহে বিদ্যুৎ চমকে-চমকে উঠছে। কোমরটি ক্ষীপ্ত। নয়নকোণ দুর্লভ।

এ-মেয়ে যদি একবার সুচিত্রা সেনের মতো হেসে আমাদের পানে তাকায়!

ঈসত হাসনি সনে
 মুখে হানল নয়ন বানে।

২

১৯৪৫-এর পাবনা। দোলপূর্ণিমার রাত। রমা পনেরো। শ্রীরাধা সেজেছে। সে নাচছে। কৃষ্ণার পাশের বাড়ি, অর্থাৎ মঙ্গলশ্রী চাকীর বাড়িতে। সেখানেই আবার বিশ্বকর্মা পুজোয় ভিয়েন বসেছে। পাশের বাড়ির মেয়ে কৃষ্ণ সকাল থেকে এই পুজো বাড়িতে। ঠোঁটের ওপর তার অল্প-অল্প ঘাম। যে-কোনও উৎসবে যেমন, বিশ্বকর্মা পুজোর দিনেও কৃষ্ণার পরনে গাছকোমর-বাঁধা শাড়ি। তার পনেরো বছরের তনুশ্রী শাড়িতে যেমন খোলে, অন্য পোশাকে তেমন নয়। সে কখনও

রান্নার কাছে, উনুনের আঁচ লেগে তার লাবণ্য যেন উখলে উঠছে। আবার কখনও সে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে হই-হই করে লাটাই হাতে। কোনও কিছুতেই অনেকক্ষণ মন বসে না কৃষ্ণার। তার মধ্যে সারাক্ষণ কাজ করে একটা ছটফটানি। সে হঠাতে লাটাই ছেড়ে ডাক দেয় প্রতিমা, কণা, সন্ধ্যা, ফুলরানি, মঞ্জুশ্রী আর হেনাকে। মঞ্জুশ্রীদের ছাদেই শুরু হয় একাদোকা খেলা। পূর্ণিমা সম্মেলনেও কম উৎসাহ নয় কৃষ্ণার। এটা মোটামুটি বড়দের অনুষ্ঠান। কলকাতা থেকে আসেন অপরেশ লাহিড়ি-বাঁশরি লাহিড়ির মতো সংগীতশিল্পীরা। মস্ত একটা স্টেজ। স্টেজের পাশেই একটা থাম। অনুষ্ঠান দেখতে কৃষ্ণা সেখানেই দাঁড়ায় তাঁতের শাড়ি পরে। স্টেজে যেই থাকুন, দর্শকের দৃষ্টি বারবার চলে যায় থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো ওই মেয়েটির দিকে। এত সুন্দর দেখায় তাকে, সেই মায়ায় মন জড়িয়ে যায়। কৃষ্ণা সেটা বোঝে। মনে-মনে মজা পায় পুরুষদের আবিষ্টি, অবশ হতে দেখে।

কৃষ্ণার মধ্যে ক্রমশ তৈরি হচ্ছে অহংবোধ। তার মধ্যে লুকিয়ে আছে আগুন, আঘাতকাশের অপেক্ষায়। সে ক্রমশই হয়ে উঠছে সচেতন। এই অহংবোধ, আঘাতচেতনা ছাড়া জীবনে রুজ্জুকিছু করা যায় না। কেউ-কেউ কৃষ্ণাকে অহংকারী ভাবে। আপাতকাতে কৃষ্ণাকে বিচার করলে এমন ধারণাই স্বাভাবিক। কৃষ্ণা সবার সঙ্গে অকপটে মিশছে, আড়তা দিচ্ছে, অথচ তৈরি করছে আড়াল, সরেঁ-বাঁচে তার নিজস্ব বৃন্তে, তার অনেকটাই বন্ধুদেরও ধরাহোয়ার বাইরে। কৃষ্ণা সম্পর্কে এমন একটা অস্বস্তি তৈরি হল তার একান্ত কাছের মানুষদের মধ্যেও। তার কথায়, তার শরীরভাষ্য, তার ব্যবহারে এসেছে এমন ঝঝুতা, যা আটপৌরে বাঙালি মেয়ের মধ্যে দেখাই যায় না। ক্রমশ তার চারপাশের মানুষজন বুঝতে পারছে, কৃষ্ণা জানে সে কী হতে চায়। তার সামনে দেখা দিয়েছে তার নিজস্ব পথ ও লক্ষ্য। সে হতে চলেছে অনেক দূরের যাত্রী। সে নিজেকে অতিক্রম করবে। হয়ে উঠবে অন্য কেউ। ইচ্ছামতী আর পদ্মায় বর্ষা নামলে কৃষ্ণার মনে উখলে ওঠে আনন্দ। ও ভিজতে ভালবাসে নদীচরে নবধারাজলে। বছর পল্লেরোর কৃষ্ণা, নদীচরে ভিজছে বৃষ্টিতে, যেন চণ্ডীদাসের রাধা, গলিতবসন, সরোবরময়ী :

লাবণ্য জল তোর সিহাল কুস্তল
বদন কমল শোভে অলক ভষল।

রাধার শরীর-সরোবরে মুখটি পদ্মের মতো বিরাজমান। সেই মুখের উপর উডুকু কেশরাশির খেলা যেন উড়স্ত ভ্রমর। নদীতীরে ভেজা রমার দিকে

তাকিয়েও পাবনার সেই কবির মনে আসে চণ্ডীদাস : রমার ভেজা গাল যেন
মহুয়া ফুল। যেখানে চোখ পড়ে সেখানেই তরলতা, রমার হাসি যেন সিঙ্গ
পদ্ম, পদ্মের ভেজা পাপড়ির মতো রমার ঠোঁট, রমার বৃষ্টিভেজা অধর যেন
ভিজে বাঁধুলি ফুল (ফুটিল বঙ্গনী ফুল বেকত অধর), রমার সিঙ্গবাহু ঠিক
যেন বৃষ্টিমাত মৃগাল, ভিজে কোমরের খাঁজ যেন সরোবর ঘাটের সোনার
সিঙ্গি। কবির কঞ্জনায় ভেজা রাধা আর রমা মিশে যায়, কবি তফাত করতে
পারে না তাদের। নদীতীরের বৃষ্টি থেকে ভিজে শাড়ি পরে বাড়ি ফেরে রমা।
কবি সে দিকে তাকিয়ে মনে-মনে বলে “সুন্দরী রাধা লো, তুমি
সরোবরময়ী।”

ইছামতী আর পদ্মায় হয় নৌকা-বাইচ। দেখার মতো দৃশ্য। দুই নদীতে
নৌকার দৌড় নিয়ে বিশেষ উৎসাহ রমার। যতই বাড়ে নৌকার গতি, ততই
উচ্ছলে ওঠে রমার উদ্বীপনা। সবচেয়ে দ্রুত নৌকাটির সঙ্গে পাড়ি দেয় তার
মন। বিকেলবেলা শেষ হয় খেলা। ঘনিয়ে আসে মেঘ। নামে বৃষ্টি। বৃষ্টির
মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে রমা। বাড়ি ফেরার আঙ্গ নেই তার। বর্ষার ইছামতী,
বর্ষার পদ্মা তাকে টানে।

১৯৪৭ সাল। রমা সতরোঁ সে ইতিমধ্যেই হয়ে উঠেছে অনেক
অন্যরকম। কিশোরীর স্ববৃক্ষের ধরতে পারে না তার বন্ধুরা। দেখা
দিয়েছে নতুন আত্মবিশ্বাস, নিতুন তেজ, নতুন অহংকার। তাকে পেরিয়ে
যেতে হবে। পৌছতে হবে। সে পেয়েছে তার পথের সন্ধান, লক্ষ্যের
আভাস। একদিন হঠাৎ সে ক্লাসের মধ্যে বন্ধুদের সঙ্গে আড়তা মারতে-
মারতে ডেক্সের উপর পা তুলে বলল, ‘আমি এ-পৃথিবীতে কিছু একটা
করতে এসেছি, হারিয়ে যেতে আসিনি, আমার মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকব
আমি, তোরা দেখিস।’ বন্ধুরা তো অবাক। অথচ এমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে,
জোরের সঙ্গে কথাটা বলেছে রমা, তাকে বিশ্বাস না করেও উপায় নেই।
বন্ধুদের মধ্যে একজন বলল, ‘কী এমন কীর্তি তুই পৃথিবীতে রেখে যাবি?
তবে সিনেমায় অভিনয় করলে হয়তো...।’ রমা মুচকি হেসে বলল, ‘দেখা
যাক।’

রমা হবে অভিনেত্রী! ঠাকুর্দা জগবন্ধু দাশগুপ্তের অনুমতি পায়নি রমা
পাড়ার অনুষ্ঠানে গান গাইবার। আর সে-মেয়ে সিনেমায় নামবে! পাবনার
বনমালী ইনসিটিউটে ‘কোন বনের কিশোর’ গানটি গাইবার কথা রমার।
গানের সঙ্গে নাচবে পাড়ার মেয়ে সন্ধ্যা। রমাই তাকে শিখিয়েছে এই নাচ।
শেষ মুহূর্তে ঠাকুর্দার অনুমতি পেল না। সেই রমা করবে অভিনয়? এ তো

অলীক ভাবনা । বরং রমা করবে ঘরকল্পা, ওর হাতের দারুণ রান্না খেয়ে মুক্ষ হবে শ্বশুরবাড়ি, এটাই তো স্বাভাবিক । পাবনার পিকনিক জমে ওঠে রমার হাতের রান্নাতেই । আলু কপি কড়াইঙ্গি পটল, এমনকী টেঁড়শ দিয়ে রমার পাঁচমিশালি যে-খেয়েছে সেই জানে, তার হাতের কী গুণ ।

বাবা-মার সঙ্গে পুরীতে বেড়াতে গেল রমা । আর সেখানেই বিকেলবেলার সমুদ্রতীরে রমাকে দেখলেন এক বৃদ্ধা, দিবানাথ সেনের ঠাকুমা । নিয়ুঁত সুন্দরী বাঙালি মেয়ে বলতে চোখের সামনে যে-মেয়ে ভেসে ওঠে এ-মেয়ে তো তা-ই, রমাকে দেখা মাত্র মনে হল বৃদ্ধার । ভাবলেন, এই মেয়েকে নাতবউ করতেই হবে । আলাপ করলেন বাবা-মার সঙ্গে । বললেন, নাতি দিবানাথ আমার ব্যারিস্টার ছেলে আদিনাথ সেনের পুত্র । বিয়ের কথা পাকা হল পুরীতেই । রমার বাবা-মা ভাবতেই পারেননি কলকাতার এমন অভিজাত ধনী পরিবারে রমার কোনওদিন বিয়ে হতে পারে, কোনওরকম বরপণ ছাড়াই! ঈশ্বরকে মনে-মনে প্রণাম জানান তাঁরা । কৃতজ্ঞবোধ করেন নিজেদের সৌভাগ্যের কাছে । রমার মতো কল্পনা মেয়ের বাবা-মা হতে পারা কি কম সৌভাগ্য!

তবু মনে ভয় । ব্যারিস্টার আদিনাথের কি পছন্দ হবে রমাকে? ধনী, অভিজাত, দাস্তিক আদিনাথ রমার মধ্যে তাঁর যোগ্য পুত্রবধূর দেখা নাও পেতে পারেন । তিনি একবুরু রমাকে দেখতে চাইলেন । সেজন্য রমাকে আসতে হল কলকাতায় । আদিনাথ রমাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন মনোহরপুকুর রোডে আঞ্চলীয় সুরেন্দ্রনাথ সেনের বাড়িতে । এবং সেখানেই মেয়ে দেখলেন তিনি । রমাকে দেখার পর বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকলেন । রমার বাবা-মা, করুণাময় আর ইন্দিরা ভাবলেন আদিনাথের পছন্দ হয়নি, অতএব তাঁর ছেলের সঙ্গে রমার বিয়ে হবে, এমন আশা করাটা আর ঠিক হবে না ।

আদিনাথ হঠাৎ গম্ভীরভাবে করুণাময়কে বললেন, এখনি বিয়ের ব্যবস্থা করুন । যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি এ-মেয়েকে পুত্রবধূ করে ঘরে তুলতে চাই ।

কিন্তু অত তাড়াতাড়ি তো বিয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, কিছুটা থতোমতো খেয়ে বললেন করুণাময় ।

কেন নয়? কোনও পণ লাগবে না । কিছু-ই দিতে হবে না আপনাদের । আমি দেরি করতে চাই না । কাল থেকে লেগে পড়ুন । ঠিক হয়ে যাবে সব ব্যবস্থা ।

কিন্তু আপনার ছেলেকে একবার দেখাবেন না? তার মতামতেরও তো প্রয়োজন আছে, সুন্দরীবে বললেন ইন্দিরা।

বেশ, দিবানাথকে বলব রমাকে দেখে যেতে। আমার যখন পছন্দ হয়েছে, ওর হবেই, বললেন আদিনাথ।

রমাকে দেখতে এলেন দিবানাথ। পরনে স্যুট। চলনে-বলনে উন্নাসিক সাহেব-সাহেব ভাব। এ-ছেলে কি রমাকে পছন্দ করবে? নার্ভাস করণাময় আর ইন্দিরা।

রমা সরাসরি তাকাল দিবানাথের দিকে। সেই দৃষ্টিপাতের মোহে আটকে গেলেন দিবানাথ। রমা সুন্দরী, এ-কথা দিবানাথ শুনেছিলেন তাঁর দিদিমার কাছে। কিন্তু যে-মেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল দিবানাথের সে তো শুধু সুন্দরী নয়, সে তো মোহিনী। এ-মেয়ের দৃষ্টির সামনে দিবানাথের সাহেবিপনা, উন্নাসিকতা সব যেন অবশ হয়ে গেল।

‘আমার বিয়ে। খুব তাড়াতাড়ি।’ কলকাতা থেকে ফিরে বন্ধুদের বলল রমা। এমনভাবে বলল, বন্ধুরা বুঝল বিয়ে করার এতটুকু ইচ্ছে নেই তার, বাবা-মার ইচ্ছায় বিয়ে করতে বাধ্য হচ্ছে।

বন্ধুরা জানতে চাইল, কার সঙ্গে বিয়ে?

রমা বলল, ছেলে কলকাতার। থাকে বালিগঞ্জ প্লেস। ব্যারিস্টার আদিনাথ সেনের ছেট ছেলে-দিবানাথ। শুনেছি বড় ছেলে বিদেশে থাকে। বড় জা খুব স্টাইলিশ। কী জানি, ওদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারব কি না।

রমার মন খারাপ আরও একটা কারণে—পাবনার বন্ধুবান্ধব আঞ্চলিকজন হেড়ে চলে যেতে হবে কলকাতায়। শুন্দরবাড়িতে সে কি পাবে পাবনার স্বতঃস্ফূর্ত জীবন?

১৯৪৭ সালেই রমার বিয়ে হয়ে গেল দিবানাথের সঙ্গে। বিয়ে হল রমাদের বাড়িতেই। খুব সুন্দর করে সাজানো হল বাড়িটা। বন্ধুদের ভিড়ে সঙ্গে থেকেই জমজমাট বিয়ে বাড়ি। নহবতের সুর, ভিয়েনের সুবাস, আনন্দের হই-হই, সব মিলিয়ে ভরপুর সঙ্গে। তার মধ্যে কনের সাজে রমা। পরনে লাল বেনারিসি। জরি দিয়ে বাঁধা খোঁপা। কপালে চন্দনের টিপ। ঝলমল করছে লিচুকাটা নতুন বালা। আঙুলে আলো জুলে জড়োয়া আংটি। ম্যাচিং জড়োয়া হার। এত আলো ঝলমল আনন্দের মধ্যে সবার মন ঝাপসা হয়ে আছে মনকেমনে—পাবনার সেরা সুন্দরী যে চিরদিনের জন্যে চলে যাচ্ছে কলকাতায়। কবিটিও উৎসবের মধ্যে বিষণ্ণ। সে এগিয়ে গেল রমার দিকে একগুচ্ছ লাল গোলাপ নিয়ে। রমা তাকাল তার দিকে। কী গহন সেই

দৃষ্টি! কবির মনে হল, এ-চোখ সত্যিই পাখির নীড়ের মতো। বাড়ি ফেরা যায় সেখানে। কাল থেকে রমা আর পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে তার দিকে তাকাবে না। কাল থেকে আমি গৃহহারা হব, ভাবল কবি।

দিবানাথকে দেখতে তেমন কিছু ভাল নয়। রমার থেকে কয়েক ইঞ্চি
লম্বা। গায়ের রং-ও বড়জোর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কিন্তু শরীরের গঠন ভাল,
যাকে বলে পুরুষালি চেহারা। রমার মতো সুন্দরীর পাশে খুব যে বেমানান
লাগছে তাও নয়। তার কারণ, দিবানাথের ব্যবহারের আর কথাবার্তার
কৌলীন্য। রমাকে বিয়ের রাস্তিরেই দিবানাথ জানিয়ে দিলেন, তাঁর ডাক নাম
তুতু।

বিয়ের পিড়িতে ঘটে গেল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। বিয়ের লগ্ন
আটটায়। রমা ঠিক সময়ে বিয়ের পিড়িতে বসে ফুলপিসি আর বাণীপিসির
দিকে তাকিয়ে বলল, আমি ঘোমটা পরে বিয়ে করব না। মুখ লুকিয়ে বিয়ে
করতে যাব কেন? দিবানাথ তাকালেন রমার দিকে। ততক্ষণে রমা সরিয়ে
ফেলেছে ঘোমটা। দিবানাথের দিকে তার স্মৃতির দৃষ্টিতে কোথাও নেই
এতটুকু কুণ্ঠা। দিবানাথ বুঝলেন, যে-মেঝেটির সঙ্গে তাঁর বিয়ে তার বয়স
মাত্র সততেরো হলে কী হবে, এ-মেঝেটি প্রথম ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। এমন
পরমা সুন্দরী ব্যক্তিত্বশালিনী বটেকে সামলাতে পারবেন তো?

বিয়ের পরেই রমা দিবানাথকে নিয়ে গেল তাদের পাটনার আদি
বাড়িতে ঠাকুর্দার আশীর্বাদ নিতে। সে-বাড়িতে ঠাকুর্দা-বাবা-মা-ভাইবোন
আর পিসিদের নিয়ে ছবি তোলা হল রমা আর দিবানাথের। ছবিতে বাড়ির
সিঁড়ির উপর দিবানাথের পাশে সুন্দরী রমা। পরনে তাঁতের শাড়ি। মাথায়
ঘোমটা। দেখলে বোঝা যাচ্ছে কনেবউ। কিন্তু যেটা চোখে পড়ে তা হল
রমার ব্যক্তিত্ব। প্রায় পঁচিশ-ছাবিশ জনের গ্রন্থ ছবিতেও রমাকে
আলাদাভাবে চোখে পড়ে। বোঝা যায় যে আর পাঁচজনের মতো নয়।
দিবানাথ কিন্তু অনেকের মধ্যে হারিয়ে গেছেন। তাঁকে বিশেষভাবে চোখে
পড়ে না।

পাবনা আর পাটনার পর্ব চুকিয়ে রমা চলে এল কলকাতায়। রমা
শুণুরবাড়িতে চুকেই বুঝল, নতুন জীবনের শুরু হতে চলেছে এমন এক
বাড়িতে, পরিবারে, পরিবেশে যার সঙ্গে কোনও মিল নেই ফেলে আসা
পাবনার পরিবেশ ও জীবনের। ভয় করল, ব্যারিস্টার শুণুর আদিনাথের এত
বড় বাড়িটার মধ্যে সে একা-একা হারিয়ে যাবে না তো? এত বড় বাড়িতে
সে আগে কখনও থাকেনি। অনভ্যন্ত রমা ভুগতে লাগল অস্বস্তিতে।

বাড়িটাকে চিনতে জানতেই তো ক'দিন কেটে যাবে, ভাবল রমা। বিশাল বাড়িটাকে দালান-বারান্দা-ছাদ-উঠোন নিয়ে যত না ভাল লাগল, তার চেয়ে বেশি ভাল লাগল বাড়ির সামনে বিরাট পুকুরটাকে। বাগান-দিঘি-গাড়িবারান্দা নিয়ে যেন ঝুপকথার বাড়ি। রমার নিজেকে মনে হল নতুন রাজবধূ, পাবনার জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিছিন্ন। রাতারাতি এই পরিবর্তনকে কী করে সামলাবে রমা?

আদিনাথের দুই ছেলে, ছোকন আর তুতু। এক মেয়ে, সোনা। রমা ক্রমশ বুবল, এ-বাড়িতে সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। প্রত্যেকের রয়েছে তার নিজস্ব জগৎ, যে-জগতের বাইরে পা বাঢ়ানো এদের স্বত্ত্ববিরুদ্ধ। পাবনায় যেমন সবাই মিলে থাকার ছেট-ছেট খুশি, আহুদ ছিল, রমার শৃঙ্খলবাড়িতে তা নেই। এটাই সম্ভবত কলকাতার জীবন, প্রাথমিকভাবে বিপুল বৈভবের মধ্যেও শহরজীবনের ধার্কা খেল রমা।

পাবনার জন্য মন কেমন করে তার। বাবা-মা, ভাইবোন, বক্ষদের কথা, আমবাগান-জামবাগান, জজসাহেবের লালমাটি, কাছারিবাড়ির পাশ দিয়ে পদ্মায় যাবার রাস্তা, ইছামতীর তীর, ক্ষেত্রাদাম-বট-অশ্বথের বাগানে বর্ষা, সারি-সারি কাঁঠাল, কুল, জামকুল-শুষ্ক, পলিটেকনিকের মাঠ—এসব মনে পড়লে রমা ছুটে চলে যায় বাড়ির বাগানে, গাছপালা ফুলফলের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া সুর আর সুরিয়াকে ফিরে পাবার চেষ্টা করে। যখন খুব মন খারাপ লাগে উপুড় হয়ে শুয়ে রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' পড়ে আর আপন মনে কবিতার ছন্দে-ছন্দে পা দোলায় কিংবা বারান্দায় বসে সেলাই করে, দিবানাথের রুমালে ছুঁচসুতোর সেলাইয়ে ফুটিয়ে তোলে ছেট একটা D।

রমা বুবতে পারে, দিবানাথ তার স্বামী, কিন্তু বক্ষ নয়। যার সঙ্গে হৃদয়ের কথা বলা যায়, এমন মানুষ নয় দিবানাথ। দিবানাথের খুব কাছের মানুষ হওয়ার চেষ্টা করে রমা, কিন্তু মানুষটি যে তার চারপাশে দিয়ে রেখেছে অদৃশ্য বেড়া। কেমন করে সেই বেড়া ভেঙে রমা চুকবে দিবানাথের অহংকারী মনের অন্দরে?

সুন্দরী বউ নিয়ে দিবানাথের মনে বেশ অহংকার তৈরি হয়েছে। কোনও পার্টি বা নেমস্তন্ত্র বাড়িতে রমাকে সঙ্গে নিয়ে দিবানাথ যখন যান, রমা পায় সেই অহংকারের তাপ। আর পাঁচজন রমার দিকে মুঝ হয়ে তাকিয়ে, সেই ব্যাপারটা তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করেন দিবানাথ। কিন্তু সারাদিন রান্নাঘরে কাটিয়ে দিবানাথের জন্য যখন মনের মতো রান্না টেবিলে নিজের হাতে পরিবেশন করে রমা, অপেক্ষা করে সামান্য একটু তারিফ বা প্রশংসার

জন্য—রমার মনে হয় সে অপেক্ষা ফুরোবার নয়। শেষ হয় স্বামীর খাওয়া, উঠে যান টেবিল থেকে। রমার মনে পড়ে বাবার কথা। রমার হাতের রান্না থেতে কী ভালই না বাসেন তিনি।

আমার হাতের রান্না তোমার ভাল লাগে না? রমা জিজ্ঞেস করে।

তুমি রান্না কর! কেন, রান্নার লোক নেই! ছুটি নিয়েছে?

রমা বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে দিবানাথের দিকে। তারপর মাথা নিচু করে মৃদু ঘরে বলে, মাঝে-মাঝে তোমার জন্য রান্না করতে ইচ্ছে করে, তা-ই করি। দিবানাথ কিছু না বলে চুরুট ধরান। রমা ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়।

আদিনাথের অন্য জগৎ। অভিজ্ঞাত রাশভারী মানুষটির ধারে-কাছে বড় একটা কেউ যায় না। আদিনাথ পছন্দ করেন এই দূরত্ব, অহংকারী একাকিত্ব। রমা শ্বশরকে দূর থেকে দেখে, ইচ্ছে হয় বাবা বলে কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু কিছুতেই পারে না। শ্বশরের আজ্ঞায় যখন ঘরে ঢোকে, মাথায় ঘোমটা তুলতে হয়। বউমা কি মেয়ে হতে পারে না? রমার ইচ্ছে করে আদিনাথকে জিজ্ঞেস করতে। রমা হয়তো আদিনাথের মনের মতো পুত্রবধু। কিন্তু কাছের কল্যান নয়। একথা বুঝতে পাইল হয় না রমার।

দিবানাথের কাছের মানুষ হওয়ার মেয়েন আরও শক্ত। তুতু কি হতে পারে না তার হারিয়ে যাওয়া পুরুষটা, নদীর তীর, কাশের বন, আম-জামের বাগান, পদ্মার সূর্যোদয়, ইছামতীর সূর্যাস্ত? রমার জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া সব সৌন্দর্য কি ফিরে আসতে পারে না তুতুর সঙ্গে তার সম্পর্কে?

বেড়াতে যাবে, কোথাও একটা, যেখানে নদী আছে, বাগান আছে, আছে পুরুষাট?

হ্যাঁ, যাব, লক্ষনে নিয়ে যাব তোমাকে। লক্ষন শহরে অনেক বাগান আছে। আছে টেমস-এর মতো নদী। কিন্তু পুরুষাট! তুমি এখনও থেকে গেলে গ্রামের মেয়ে। দিবানাথের কঢ়ে একই সঙ্গে বিস্ময় ও হতাশা। রমার মনে পড়ে পাবনার সেই কবিকে। একদিন সে মৃদু কঢ়ে বলেছিল রমাকে, তোমার চোখের দিকে তাকালে মনে হয় বাড়ি ফিরি, পাখির নীড়ের মতো তোমার চোখ, তোমার নাম দিলাম বনলতা।

রমার মূল সমস্যা, যদিও চারধারের পরিবেশে আপাত ভাবে নালিশ করার মতো কিছু নেই, তার জীবনে নেই কোনও মনের মানুষ। সুন্দর শান্ত জীবন, বেশ কেটে যাচ্ছে দিন, কিন্তু রমার মনে হয় এমন যদি কাউকে পাওয়া যেত পাশে যাকে বলা যায় মনের কথা, যার সঙ্গে ভাগ করা যায়

ছেট দুঃখ, ছেট খুশি, ছেট অভিমান, যার সঙ্গে উদাস হওয়া যায়। স্বামী দিবানাথের সঙ্গে মনের বক্ষন যেন প্রথম থেকেই আলগা, সাতপাকে বেঁধেও যেন সেই বক্ষনের সুতো ঝুলে আছে অগোছালোভাবে, এই বোধ খচ-খচ করে রমার মনে।

বালিঙঞ্জ প্লেসের দুর্গামন্দির ক্লাবের ছেলেরা এসেছিল আমার পারমিনশন নিতে। ওরা ক্লাবের উৎসবে নটীর পূজা নাটক করছে। আমার সুন্দরী বউকে ওরা চায় রান্নির ভূমিকায়। রমাকে রাতে খাবার টেবিলে বললেন দিবানাথ। তাঁর কষ্টে নেই কোনও রকম উৎসাহ বা আবেগ। খবরটা শনে রমার বুক কেঁপে উঠল। দিবানাথের দিকে তাকিয়ে মৃদু কষ্টে জিজ্ঞেস করল, তুমি কী বললে?

আমি আবার কী বলব? বললাম, রমা যদি চায় অভিনয় করবে, আমার এ-ব্যাপারে কিছু বলার নেই।

আমি অভিনয় করব না। ওদের জানিয়ে দিয়ো। এ-বাড়ির বউয়ের পক্ষে ক্লাবের উৎসবে অভিনয় করা সম্ভব নয়। বলল রমা।

যা বলার তুমিই বলো। ওরা তোষাক্ত কাছে আসবে। আমি এর মধ্যে থাকতে চাইছি না।

তুমি থাকবে না মানে? আমি যদি অভিনয় করি, নিশ্চয় তোমার মতের বিরুদ্ধে করব না। তা ছাড়া তোমার মত হলেই তো হল না, বাবার মত চাই। আমি বাবাকে যতটুকু জানি, তিনি কখনই মত দেবেন না। আমি সংসারে কোনও রকম অশাস্তি চাই না। তুমি ওদের বলে দিয়ো। সুন্দরী মেয়ের অভাব নেই, অন্য কাউকে রান্নির চরিত্রে ভাবতে।

এ-পাড়ায় আমার বউয়ের মতো সুন্দরী আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। থাকলে চোখে পড়ত নিশ্চয়। তা ছাড়া, আমার বাবাকে তোমার থেকে আমি বেশি জানি। তিনি এসব তুচ্ছ বিষয়ে মাথা ঘামাবার মানুষ নন।

পাড়ার ক্লাবে অভিনয় করাটা কী এমন দোষের? তা ছাড়া সারাদিন তো তার কিছুই করার থাকে না। পাড়ার ক্লাবে অভিনয় করলে পার্ট মুখ্স্ত, রিহার্সাল, আড়ত এসব নিয়েও তো ব্যস্ত থাকা যাবে, ভাবল রমা। ক্লাবকে সে জানিয়ে দিল, শ্বশুরমশাই মত দিলে সে অভিনয় করবে। কিন্তু শ্বশুরমশাইয়ের কাছে কথাটা পাড়বে কে? রমা নিজেই বলবে আদিনাথকে, এমনই সিদ্ধান্ত নিল সে। এই সঙ্গে সে নিশ্চিত, আদিনাথ হঞ্চার দিয়ে ‘না’ বলবেনই।

রাত্রে খাওয়ার পরে শুয়ে পড়ার আগে আদিনাথ বই পড়েন। এই সময়টা তিনি একা থাকতেই ভালবাসেন। খুব প্রয়োজন না হলে কেউ তাঁর ঘরে ঢোকে না। রমা ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল। অন্যদিন শুশ্রামশাইয়ের সামনে মাথায় ঘোমটা দেয়। আজ ঘোমটা ফেলে আদিনাথের ঘরে।

আদিনাথ বই থেকে মুখ তুলে গন্তীর গলায় বললেন, কিছু বলবে বউমা?

রমা শান্তভাবে বলল, 'ক্লাবের ছেলেরা ক'দিন ধরে বাড়িতে যাতায়াত করছে। ওরা প্রথমে আপনার ছেলের সঙ্গে দেখা করে। তারপর আমার সঙ্গে। ওদের একান্ত ইচ্ছে ক্লাবের থিয়েটারে আমি অভিনয় করি। আমি বলেছি, আপনার মত থাকলে তবৈই...'।

আদিনাথ বেশি কথার মানুষ নন। বললেন, এই সামান্য ব্যাপারে... নিচয় অভিনয় করবে, আমি দেখতে যাব।

পাড়ার থিয়েটারে রমার যে প্রাথমিক ঝিলিকটুকু দেখা গেল অটীরে তার খবর পৌছল টালিগঞ্জের স্টুডিয়োপাড়ার। তেই সঙ্গে এই খবরও যে এই পরমা সুন্দরী মেয়েটি আদিনাথ সেনের প্রেমবধূ। কার এত সাহস যে তাকে সিনেমায় নামার কথা বলবে। তবু অনেক পথ যুরে দিবানাথের কানে কথাটা পৌছল যে কোনও-কোনও বাঙালি পরিচালক রমাকে পেলে তাকেই নায়িকা করে ছবি করবেন।

সিনেমায় নামতে চাও? একেবারে নায়িকা হয়েই শুরু করতে পার। আমার কাছে খবর আছে, বাংলা সিনেমা তোমাকে চাইছে। খাবার টেবিলে স্ত্রীকে বললেন দিবানাথ।

পাগলামি করো না। পাড়ার থিয়েটারে অভিনয় আর সিনেমায় অভিনয় এক জিনিস নয়। ওসব আমার দ্বারা হবে না। তা ছাড়া, তোমার বাবা মত দেবেন ভেবেছ? এ-বাড়ির বউয়ের পক্ষে সিনেমায় অভিনয় করার স্বপ্ন দেখাও অন্যায়। রমার উত্তর শুনে দমে যাবার পাত্র নন দিবানাথ। পুরো ব্যাপারটায় তিনি বেশ একটা মজার উদ্দেশ্য পেয়েছেন। বললেন, বেশ তো, সিনেমায় না নামো সিনেমার প্লেব্যাক সিঙ্গার হতে তো তোমার আপত্তি নেই। ওরা তো চাইছে তোমাকে প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবেও।

রমা ক'দিন ধরেই যেন বুঝতে পারছে তার ভাগ্যের অদৃশ্য শক্তি তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে টালিগঞ্জের স্টুডিয়োপাড়ার দিকে। এই টান থেকে বেরোবার উপায় নেই। কিন্তু প্লেব্যাক সিঙ্গার হওয়া কি সহজ ব্যাপার? রমার গানের গলা আছে, কিন্তু তেমন ভাবে গান তো সে শেখেনি। যারা

তাকে স্টুডিয়োপাড়ায় চাইছে তারা কি তার গান শুনে আদৌ মুঝ? না কি তার রূপে চোখ ধাঁধিয়ে গেছে টালিগঞ্জের কিছু পরিচালক আর প্রযোজকের, যাঁদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে নেমন্তন্ত্ববাঢ়িতে, পার্টিতে বা ঘরোয়া আড়ডায়?

অনেকটা দিবানাথের উৎসাহেই ১৯৪৯-এর বসন্ত বিকেলে স্টুডিয়োপাড়ার দিকে পা বাড়াল রমা। সঙ্গে দিবানাথ। পার্ক স্ট্রিটের একটি স্টুডিয়োর সামনে গাড়ি থামল। এখানে সিনেমার নেপথ্য গায়িকা হিসেবে অভিশন দিতে হবে রমাকে। গীতিমতো নার্ভাস সে।

এই অসামান্য সুন্দরী মহিলা সিনেমায় না নেমে হবেন নেপথ্য গায়িকা? পার্ক স্ট্রিট স্টুডিয়োতে আলোড়ন পড়ে গেল রমাকে নিয়ে। দিবানাথ অনুভব করলেন এমন কিছু একটা এবার ঘটতে চলেছে যা তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তিনি মনে-মনে তৈরি নন আসন্ন ঘটনার জন্য। পার্ক স্ট্রিট স্টুডিয়ো থেকে রমার রূপের খবর টালিগঞ্জ স্টুডিয়োপাড়ায় পৌছতে দেরি হল না।

রূপশ্রী স্টুডিয়োতে ক'দিন ধরে চলছে 'সংকেত' নামের একটা বাংলা ছবির প্রাথমিক প্রস্তুতি পর্ব। শৃষ্টিং শুরু হবে বেশ ক'দিন পরে। তখনও ঠিক হয়নি কে হবে সংকেতের নায়িকা। নতুন মুখ খুঁজছেন পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়।

রমার খবর পৌছল অর্ধেন্দুর কানে। রমার এক মামা অর্ধেন্দুর বক্ষ। তোমার ভাগ্নি রমা সেনকে একবার দেখতে চাই। শুনেছি মেয়েটি অসামান্য সুন্দরী। যদি রাজি থাকেন তাহলে সংকেতের নায়িকার জন্য ওঁর একটা স্ক্রিন টেস্ট নেব, রমার কালুমামাকে বলেন অর্ধেন্দু।

কালুমামার সঙ্গে রমা চুকল টালিগঞ্জের স্টুডিয়োপাড়ায় ১৯৪৯-এ এক দুপুরবেলায়। রমাকে দেখেই পছন্দ হয়ে গেল পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের। স্ক্রিন টেস্টেও সহজেই উতরে গেল রমা। এবার তাহলে শৃষ্টিং শুরু করলেই হয়। সংকেতের নায়িকার জন্য নতুন মুখ খুঁজছিলাম। সে-সমস্যা তো মিটে গেল, রমাকে জানালেন অর্ধেন্দু।

ক'দিন পরে অর্ধেন্দুকে ফোন করল রমা, আপনি অন্য নায়িকা খুঁজুন। স্ক্রিন টেস্টে পাশ করলেই যে সিনেমায় নামতে হবে তার কোনও মানে নেই। আমি সিনেমায় নামছি না।

রমা ফিরে গেল তার পরিপাতি গৃহবধূর ভূমিকায়। ৩২, বালিগঞ্জ প্লেসে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে আপাতত টালিগঞ্জ স্টুডিয়োপাড়া অনেক দূরের পথ। দিবানাথ আর কোনও রকম উৎসাহ দেখালেন না রমার সিনেমায় নামার

ব্যাপারে। বরং তাঁর সুন্দরী স্ত্রীকে খানিকটা আড়াল করেই রাখতে চেষ্টা করলেন দিবানাথ। মনে-মনে তিনি এই ভেবে নিশ্চিন্তও হলেন, কোনও দিনই রমার পক্ষে সিনেমায় অভিনয় করা সম্ভব হবে না, কারণ আদিনাথ সেন মত দেবেন না। আর শঙ্গরমশাইয়ের মতের বিরুদ্ধে স্টুডিয়ো চতুরে পা রাখা রমার পক্ষে অসম্ভব।

কিন্তু রমা মুখ ফিরিয়ে নিলেও টলিউড তাকে ছাড়ল না। একটা পর একটা অফার আসতে লাগল রমার কাছে। কখনও পরিচালকের ফোন। কখনও প্রযোজকের ফোন। কোনও অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে টানছে। তার ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে টলিউডেই। বাংলা সিনেমার নায়িকা না হয়ে রমা সেনের উপায় নেই। যে-ছবি থেকে এল ডাক, নাম তার শেষ কোথায়।

আদিনাথ সেদিন সকাল-সকাল বাড়ি ফিরেছেন। মেজাজও বেশ ভাল। রমা দাঁড়াল শঙ্গরের সামনে। গল্পীর আদিনাথের দিকে সরাসরি তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল, আমি যদি সিনেমায় অভিনয় করি, আপনার কি কোনও আপত্তি আছে?

তখনই এ-প্রশ্নের উত্তর না দিলে কিছুক্ষণ রমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন আদিনাথ। রমা বুঝল, শঙ্গরমশাইয়ের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলেছে, রমাকে বোঝবার চেষ্টা করছেন তিনি। রমার আরও কাছে এসে আদিনাথ প্রশ্ন করলেন, দিবানাথ জানেন কি?

আপনার মত থাকলে আমার কাছে আর কোনও বাধাই বাধা নয়। আপনার মতের বিরুদ্ধে আমি কোনও কিছু কোনও দিন করব না, বলল রমা।

তুমি আমাকে এবার গভীর সংকটে ফেললে বউমা। দিবানাথ তোমার এই ইচ্ছে কতদূর মেনে নেবে জানি না। হয়তো শেষ পর্যন্ত সমস্যাও হতে পারে। তবে তোমার যদি প্রতিভা থাকে, আমি বাধা দেব না। আদিনাথকে প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রমা। আদিনাথ চূপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন জানলার ধারে। বাইরে ডুবসূর্যের স্নান আলো। কাল যে সূর্য উঠবে তার আলো অন্য রকম, অনেক ভাঙচুরের মধ্যে প্রতিদিন তাঁর সংসারকে যেতে হবে এবার, ভাবলেন আদিনাথ।

শেষ কোথায় ছবির শ্যটিং শুরু হল নির্ধারিত দিনে। রমা দাঁড়াল ক্যামেরার সামনে। ভীষণ নার্ভাস লাগছিল তার। কিন্তু ক্ল্যাপস্টিক দেওয়ার পরেই সে যেন অন্য মেয়ে। আর ভয় নেই। নির্ভুল অভিনয় করল প্রথম শ্যটেই। সবাই ভেবেছিল রিটেকের প্রয়োজন হবে। কিন্তু প্রথম শ্যটেই ও,

কে। রমা ক্রিপ্টা বারবার পড়েছে। পার্ট মুখস্থ করেছে এমন ভাবে যাতে কোথাও এতটুকু না হোঁচট লাগে। রমা জানে তার কোনও-কোনও উচ্চারণে বাঙাল টান চলে আসে। উচ্চারণের ব্যাপারে সে বিশেষ সচেতন। রমার একমাত্র লক্ষ্য অভিনয় যেন স্বাভাবিক হয়, যেন অভিনয়কে অভিনয় বলে মনে না হয়। অভিনয় বর্জিত অভিনয় যেন হয়ে ওঠে তার স্টাইল, আয়নার সামনে দিনরাত প্র্যাকটিস করে রমা।

দিবানাথ লক্ষ্য করেন, সংসারে আর তেমন মন নেই রমার। আগে সে রান্নাঘরে অনেক সময় দিত। ঘর সাজানোর দিকেও সে ছিল বিশেষ মনোযোগী। দিবানাথ খাবার টেবিলে বসলে রমা পাশে বসে খাওয়াত। রমা যেন রাতারাতি বদলে গেছে। স্টুডিয়ো থেকে শ্যটিং সেরে বাড়ি আসার পরেও তার মন পড়ে থাকে ক্যামেরার লেন্সে। সে ফটোর পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে আয়নার সামনে, তার নিজের চোখই তখন ক্যামেরার লেন্স। সে নিজেকে দেখে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে, কোন অ্যাক্সেল থেকে সে ঠিক কেমন, ক্যামেরার লেন্সের সামনে কত সাবলীল ভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় ব্যক্তিত্ব, সৌন্দর্য, আবেদন, আকর্ষণ। অভিনয়ের বাইরে রমার যেন আর কোনও অস্তিত্ব নেই।

টাকার অভাবে হঠাতে বন্ধ হয়ে গেল শেষ কোথায় ছবির শ্যটিং। রমা স্টুডিয়োতে গিয়ে শুনল, শ্যটিং হবে না। তার মনে হল, পায়ের তলায় মাটি নেই। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল তার আশা-আকাঙ্ক্ষা। দমকা হাওয়ায় উড়ে গেল আসন্ন ভবিষ্যৎ। পরক্ষণেই হাসি পেল তার। মনে হল, যা হওয়ার তা-ই তো হয়েছে। ঈশ্বর যা করেন, তা মঙ্গলের জন্য। সে আদিনাথ সেনের পুত্রবধু, সিনেমার ভূত তার ঘাড়ে চেপে আর কতদিন থাকবে! রমা আবার মন দেয় সংসারের কাজে। কিন্তু ক'দিনের মধ্যেই বুঝতে পারে সংসারে আগের মতো মন বসানো তার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। সে মনে-মনে শুনতে পায় ক্ল্যাপস্টিকের শব্দ, শুনতে পায় পরিচালকের কঠোর, স্টার্ট সাউন্ড, স্টার্ট ক্যামেরা, অ্যাকশন, কাট! সে দেখতে পায় শ্যটিং-এর অবসরে মেকআপ-ম্যান এগিয়ে আসছে তার দিকে। তাকে করে তুলছে আরও সুন্দর, নিখুঁত, মায়াময়। রমার ভিতরটা ছটফট করে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবার জন্য। তার চারপাশের বাস্তব পৃথিবীটা ক্রমশ আবছা হয়ে আসে, চেনা সংসারের চেহারাটা মিলিয়ে যায়, রমা গিয়ে দাঁড়ায় আয়নার সামনে, বুঝতে পারে সে অভিনেত্রী ছাড়া আর কিছু নয়, চিরদিনের নায়িকা।

হ্যালো, মিসেস সেন বলছেন? আমি পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত। আমার আগামী ছবি সাত নম্বর কয়েদি-র শ্যাটিং শুরু হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি। আপনি কিন্তু আমার ছবির নায়িকা। আমার একান্ত অনুরোধ, না বলবেন না প্লিজ।

সাতসকালে এমন একটা ফোন আশা করেনি রমা। এক বলক বাতাস যেন তুকে পড়ল বন্ধ ঘরে। তবু কষ্টে কোনও রকম তাৎক্ষণিক আহুদের আভাস মুছে দিয়ে প্রশ্ন করল রমা, ছবিতে কে কে আছেন?

ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, ভানু ব্যানার্জি, এক নিশ্চাসে বললেন, সুকুমার। রমাকে খুশি করতে আরও খবর দিলেন তিনি, ছায়াবাণীর প্রোডাকশন। সুতরাং ছবির কাজ ঠিক সময়ে শেষ হয়ে রিলিজ হবেই। তা ছাড়া, গৌরীপ্রসন্নর গান, ছবি হিট হতে চলেছে।

নায়কের নাম বললেন না তো! ছবির নায়ক কে? রমার প্রশ্নের উত্তরে কিছুটা থতোমতো সুকুমার, নায়ক! সমর রায় নামের একজনকে নিয়েছি আমরা। একটা চাস দেওয়া হচ্ছে আর কী।

সমর রায়! কোনও দিন নাম শুনেছি বলে তো মনে হচ্ছে না। আমাকেও তো কেউ চেনে না। আপনার কিন্তু বড় রিস্ক নিচ্ছেন।

ম্যাডাম, এ-ছবিতে আসলে কেনও নায়ক নেই, আপনিই সব। আর কে থাকল না থাকল কিছু এসে যায় না। কষ্টে যথাযথ গদগদ ভাব ফুটিয়ে বললেন সুকুমার।

কিন্তু সুকুমারবাবু আমি তো ঠিক করেছি অভিনয় করব না। ঘোকের মাথায় হাঁতাঁ রাজি হয়ে ‘শেষ কোথায়’ ছবিতে সই করেছিলাম। ছবিটা বন্ধ হয়ে গেছে। আমিও বেঁচেছি। ফিরে এসেছি একেবারে গৃহবধূর ভূমিকায়। প্লিজ আমাকে আর আপনারা বিরক্ত করবেন না, সরি। ফোন নামিয়ে রাখল রমা।

আধ ঘটার মধ্যে আবার ফোন। এবার সাত নম্বর কয়েদি-র শিল্প নির্দেশক সত্যেন রায়চৌধুরি, আপনাকে ছাড়া এ-ছবি হবে না মিসেস সেন, প্লিজ রাজি হয়ে যান।

আমাকে একটু ভেবে দেখার সময় দিন, বলল রমা। সারা বাত ঘুম এল না রমার চোখে। তোরের আলো ফুটল আকাশে। রমা এসে দাঁড়াল খোলা জানলার সামনে। পুবের আকাশের দিকে তাকিয়ে। তার গলায় গুণগুণ করছেন ভোরবেলার রবীন্দ্রনাথ, এ দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার? আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার? কাহার অভিযেকের তরে সোনার ঘটে আলোক ভরে, উষা কাহার আশিস বহি হল আঁধার পার?

আর কোনও দ্বিধা নেই রমার মনে। ভোরবেলার আলোয় রমা যেন পড়তে পারল তারই নবজন্মের বার্তা, ভোরবেলার বাতাস যেন ঘটিয়ে দিল তার নতুন পরিচয়ের অভিষেক। রমা বুবতে পারল, অদ্দের অমোগ টান তাকে নিয়ে যাচ্ছে অনিবার্য ভবিষ্যতের দিকে, যা কিছু ঘটতে চলেছে তার উপর কোনও হাত নেই তার, সব বাধা সংশয় অনিষ্টয়তা ভেসে যাচ্ছে তার চলার পথ থেকে অনেক দূরে। সে আজ থেকে নিরন্তর নাযিকা, চিরকালের, এই তার একমাত্র পরিচয়, তার নবজন্মের সূচনা আজ থেকেই।

স্নান সেরে পুজোর ঘরে প্রণাম করে সে সোজা চলে এল স্টুডিয়োতে। সে যেন আর কারও নয়। সব কিছু ঘরে গেল তার জীবন থেকে। নিজেকে পালকের মতো হালকা মনে হল তার। মুখে ফুটে উঠল নতুন আলো। পাশেই বসে ছিলেন ছবির পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্তের সহকারী নীতীশ রায়। তিনি রমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, রমাদেবী, আজ আপনার নবজন্ম ঘটল বাংলা সিনেমার অধিত্তীয়া নাযিকা হিসেবে। বাংলা সিনেমা যতদিন থাকবে ততদিন বেঁচে থাকবেন আপনি। আজ থেকে আপনার নতুন নাম সুচিত্রা, সুচিত্রা সেন সুচিত্রা, আপনি সিনেমার কল্যা। সাত নম্বর কয়েদি-র চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করাল রমা, সুচিত্রা সেন।

বিরতি

১৯৫৩-র ৭ ফেব্রুয়ারি। সকাল আটটা তখনও বাজেনি। ইতিমধ্যে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে গেছেন দিবানাথ। আদিনাথ তৈরি হচ্ছেন কোটে যাওয়ার জন্য। স্নান সেরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে সুচিত্রা সেন। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন নিজের দিকে। ঢাকাই শাড়িটা টান-টান হয়ে আছে তার আনকোরা শরীরের উপর। ভিজে-ভিজে এলো চুল। কিছুটা বুকে, কিছুটা পিঠে। সামান্য পাশ ফিরে দাঁড়ালেন। খুঁটিয়ে দেখলেন প্রতিটি শরীররেখা। হাসলেন। এ-হাসি ওঁদের মুক্তি করবে তো? পর্দায় ঠিক কতটা সুন্দর দেখাবে তাঁকে। বুকের মধ্যে দূর-দূর করছে। কিছুতেই স্থির হতে পারছেন না। অপেক্ষা করছেন কখন আসবে সুকুমারবাবুর ফোন। কখন নীতীশ রায় জানাবেন, ছবিটা লেগে গেছে ম্যাডাম, বাঙালি দর্শক আপনার অরূপাকে নিয়েছে। সাত নম্বর কয়েদি-র নাযিকার নাম অরূপা। অরূপার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সুচিত্রা। আজ ১৯৫৩-র ৭ ফেব্রুয়ারি মিনার, বিজলি, ছবিঘরে মুক্তি পাচ্ছে সাত নম্বর কয়েদি। অথচ বাড়ির কারও মধ্যে নেই

কোনও উৎসাহ। একবার কালীঘাটের মন্দিরে গেলে হত, ভাবলেন সুচিত্রা। মনে—মনে প্রার্থনা করলেন দেবীর কাছে, যা, যেন আমি উত্তরে যাই, আমাকে যেন নায়িকা হিসেবে বাঙালি দর্শক গ্রহণ করে, যেমন অকৃষ্ণভাবে গ্রহণ করেছে কাননদেবীকে, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে সরে গেলেন সুচিত্রা। বসলেন শোবার ঘরে পালক্ষের কোণে। ভাবলেন, সাত নম্বর কয়েদি যদি তেমন না-ও চলে, অবশ্যই চলবে সাড়ে চুয়াত্তর ছবিটা। ভারী মজার ছবি করেছেন পরিচালক নির্মল দে। মাত্র বারো দিন পরেই তো উত্তরা সিনেমায় মুক্তি পাচ্ছে সাড়ে চুয়াত্তর। সাড়ে চুয়াত্তরও তো আমিই নায়িকা, আর নায়ক, সেও তো নতুন, উন্মত্তমুমার, কিন্তু চমৎকার অভিনয় করে ছেলেটা, আর আমার সঙ্গে নাকি দারুণ মানিয়েছে। দেয়ালের গায়ে টাঙানো ক্যালেগারের সামনে দাঁড়ালেন সুচিত্রা। খুশিতে ভরে উঠল মন, সিনেমায় নেমেই প্রথম বছরে পরপর চারটে ছবির রিলিজ: সাত নম্বর কয়েদি, সাড়ে চুয়াত্তর, কাজৰী, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ক্যালেগারের গায়ে লাল কাল্পনিক চিহ্নিত চারটি রিলিজের দিন।

টেলিফোনের ডায়াল ঘোরালেন সুচিত্রা সেন। ওধার থেকে যাঁর কর্তৃত্বে দেসে এল তিনি যে পাহাড়ী স্মার্টাল, চিনতে অসুবিধে হল না।

- পাহাড়ীদা, সুচিত্রা বলছি।
- বলো, কী খবর তোমার? আজ তো...।
- ভীষণ নার্ভাস লাগছে...।

—আমারও প্রথম ছবি মীরাবাঈ-এর মুক্তির দিন খুব নার্ভাস লেগেছিল, তারপর দ্যাখো তো, আজকাল আর কিছু মনেই হয় না...ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও তো এ-মাসে রিলিজ করছে।

—হ্যাঁ পাহাড়ীদা, তুমি না থাকলে আমি কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার রোলটা পেতাম না। তুমি যদি আমাকে দেবকী বসুর বাড়িতে নিয়ে না যেতে...

—সুচিত্রা, আমি নিমিত্তমাত্র। দেবকী বসু বিষ্ণুপ্রিয়াকে অনেক দিন ধরে খুঁজছিলেন। তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল, তুমই বিষ্ণুপ্রিয়া। দেখলে তো দেবকী বসুও তা-ই ভাবলেন। আমি শুধু যোগাযোগটা করিয়ে দিয়েছিলাম।

—পাহাড়ীদা, তুমি যোগাযোগটা করিয়ে দিয়েছিলে বলেই তো এত বড় একটা ব্রেক পেলাম। বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায় বাঙালি দর্শক আমাকে মেনে নেবে পাহাড়ীদা?

—আলবাত নেবে। তুমি নিজেও জানো না কী অসাধারণ অভিনয় করেছে। অভিনয় বলে তো মনে হয় না। তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া হয়ে উঠেছ সুচিত্বা। এ-ছবি তোমাকে চিরকালের নায়িকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেবে। তুমি দেখে নিয়ো।

টেলিফোন রেখে দেবার পর কিছুক্ষণ ভাবলেন সুচিত্বা। মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন ঘূর-ঘূর করছে। আজ কি একবার ফোন করে অভিনন্দন জানানো উচিত ছিল না ওর? সকাল থেকে হয়তো শ্যটিংয়ে ব্যস্ত, খেয়াল নেই যে রামার প্রথম ছবি আজ মুক্তি পাচ্ছে। কিন্তু এত সকালে কোন ছবির শ্যটিং? নিশ্চয় বাড়িতেই আছে। একবার ফোন করে দেখি, ও নিজেও তো নতুন, আমার নার্ভাসনেসটা বুবাবে।

ওধার থেকে নারীকঠের, হ্যালো।

—উত্তম আছে, বলুন, রমা কথা বলতে চায়।

—একটু ধরুন, দেখছি।

—হ্যালো।

—রমা।

—খুব নার্ভাস?

—মনে আছে তাহলে?

—মনে থাকবে না কেন?

—তাহলে ফোন করোনি কেন? একটু ভরসা দিতেও তো পারতে।

—কে কাকে ভরসা দেবে? আমার তো একই অবস্থা। সাড়ে চুয়ান্তরের রিলিজও তো এসে পড়ল। তুমি আমি যদি ক্লিক না করি সব গেল—

—সাড়ে চুয়ান্তর হিট, তুমি দেখে নিয়ো।

—হিট তো বটেই, কিন্তু তাতে তোমারই বা কী রমা, আর আমারই বা কী?

—মানে! আমাদের ছবি হিট করবে আমার আমাদের কিছু নয়?

—হিট তো করবে তুলসী চক্ৰবৰ্তী আৱ মলিনাদিৰ জন্যে। তোমার আমার কিস্স্যু কৰার নেই।

—ছবিটা হিট কৰলে রোম্যান্টিক জুটি হিসেবে আমৰা দাঁড়িয়ে যাব।

—রোম্যান্টিক জুটি তো তুলসী আৱ মলিনা।

—উত্তম, প্লিজ একটু সিরিয়াস হও। তোমার সঙ্গে কথা বলে আৱও নার্ভাস লাগছে।

—তাহলে বসন্ত চৌধুরিৰ সঙ্গে কথা বলো।

—যা বাবো, এর মধ্যে হঠাতে বসন্ত কেন?

—রমা, তোমার প্রথম রোম্যান্টিক নায়ক কিন্তু সমর রায় বা আমি নই। তোমার প্রথম রোম্যান্টিক হিরো বসন্ত চৌধুরি। আমার কাছে তো অন্য খবর আছে।

—বাজে কথা বোকো না উত্তম।

-ঠিক আছে, আর একটিও বাজে কথা নয়। শুধু কাজের কথা।

—কী অন্য খবর আছে শুনি একটু।

—উহু। আজ রিলিজ হচ্ছে রমা সেনের প্রথম ছবি। এর চেয়ে কাজের খবর আর কী হতে পারে?

—রমা সেন নয়, বলো সুচিত্রা সেন।

—অসম্ভব। সুচিত্রা বড় পোশাকি নাম। তুমি অনেক কাছের মানুষ। রমা নামটাই আমার কাছে সহজে আসে। তুমি অনেক দূর যাবে রমা। আর তোমার-আমার জুটি বাঞ্ছালি থাবে, গোথাসে থাবে।

—কী ভাষা! জুটি যেন একটা খাবার জিনিস।

—ইতিহাস ঘটতে চলেছে রমা, আঝিস্লে রাখলাম। আর কেউ নয়, শুধু উত্তম-সুচিত্রা। সেদিন আসবেই।

—সুচিত্রা-উত্তম। নায়িকাকে জায়গা ছাড়তে শেবো।

—তথাকুন্ত ম্যাডাম। শুভেচ্ছা রইল।

১৯৫৩--ৰ ২০ ফেব্রুয়ারি। সুচিত্রা সেন স্টুডিয়োতে চুকেই বুবলেন, চারধারে চাপা উত্তেজনা। তাঁর দিকে সবার দৃষ্টি, যেন তিনি অন্য কেউ। এতটাই শুন্দি সন্তুষ্ট তাঁদের দৃষ্টিতে। পরিচালক নির্মল দে তাঁর দিকে ছুটে এসে বললেন, উত্তরায় ম্যাটিনি শো ফুল। ব্ল্যাকে টিকিট বিক্রি হয়েছে। সাড়ে চুয়ান্তর দারুণভাবে লেগে গেছে। আর দেখতে হবে না ম্যাডাম, উত্তম-সুচিত্রা সুপারহিট।

সুচিত্রার বুকের মধ্যে খচ করে উঠল। উত্তম-সুচিত্রা সুপারহিট! এই হল পুরুষশাসন। উত্তমই যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। কেউ কেন বলছে না সুচিত্রা-উত্তম? বাংলা সিনেমায় এখনও নায়কই সব, নায়কের আলোতেই নায়িকা আলোকিত। প্রমথেশ-কানন, পাহাড়ী-ছায়াদেবী। উল্টোটা নয় কেন?

দাঁড়ান-দাঁড়ান। এই তো সবে ম্যাটিনি হাউসফুল। দু-চার সপ্তাহ চলুক, তারপর বোৰা যাবে ছবিটার দৌড় কতদূর। তা ছাড়া, এ-ছবিতে আমার বা উত্তমবাবুর তেমন কিছু করার নেই। ছবিটা লাগলে, লাগবে তুলসী চক্রবর্তী আর মলিনাদির জন্য। আসল নায়ক-নায়িকা তো ওঁরাই, বললেন সুচিত্রা সেন।

কী যে বলেন ম্যাডাম। রোম্যান্টিক জুটি তো আপনারাই। ভিড় হবে আপনাদের দেখতে, বললেন পরিচালক নির্মল দে।

তা হলে আর কী, উত্তমবাবু আর আমার জন্য একটা পার্টি দিন, বাংলা সিনেমায় নতুন নায়ক-নায়িকার আগমনকে সেলিব্রেট করুন, হাসতে-হাসতে বললেন সুচিত্রা সেন।

পার্টির কথা আমরা অলরেডি ভেবেছি। আপনার আরও দুটো ছবি তো মুক্তির দিন গুনছে, কাজীরী আর ভাগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। আপনি এলেন আর জয় করলেন ম্যাডাম। বাঙালি আপনার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল।

আমার একার কথা বলবেন না। বলুন হিট করেছে উত্তমবাবু আর আমার জুটি, বললেন সুচিত্রা।

তা তো বটেই ম্যাডাম। পার্টিটা তো আপনাদের দু'জনের জন্য, বললেন পরিচালক নির্মল দে।

পার্টি থেকে বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল সুচিত্রার। বাড়ি শুন্ধান। আদিনাথ শুয়ে পড়েছেন। দিবানাথ বাড়ি টেক্সে আবার বেরিয়ে গেছেন বন্ধুদের সঙ্গে। বলে গেছেন, অনেক সমস্ত হবে ফিরতে। সাড়ি চুয়ান্তর সুপারহিট, তবু একটি বারের জন্মও অভিনন্দন জানাননি দিবানাথ। আদিনাথ অবিশ্য খুশি বউমার নেই সাকল্যে, কিন্তু আবেগবর্জিত মানুষ। সুতরাং কোনও রকম আতিশ্য নেই বউমার প্রতি তাঁর ব্যবহারে।

সুচিত্রা শোবার ঘরে একা। ফেরুন্ধারির ঠাণ্ডা বাতাস আসছে জানলা দিয়ে। জিরো পাওয়ারের নীল আলো জুলছে ঘরে। হালকা নাইটি পরে সুচিত্রা দাঁড়ালেন জানলার ধারে। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে বাগান। চাঁদের আলো এসে পড়ল ছায়াঘন শরীরে। অলৌকিক সেই সৌন্দর্য। একটা অস্পষ্ট কষ্ট সুচিত্রার মনে। কাজীরী-তে তাঁর অভিনয় করাটা উচিত হয়নি, উচিত হয়নি ওই ছোট রোলটা নেওয়া। ক্রমশ বুঝতে পেরেছেন তিনি। সমস্ত ছবি জুড়েই তো সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। আমার তো প্রায় কিছুই করার নেই। একটা নায়ক পর্যন্ত নেই আমার। বীরেন চট্টোপাধ্যায় তো সাবিত্রীর নায়ক অথচ, আমাকে তো তা বুঝতে দেওয়া হয়নি প্রথমে! বুঝতে পারলে কাজীরীর রোলটা আমি নিতাম না, ভাবলেন সুচিত্রা। মনে হল কাজীরী তাকে পিছন থেকে ছুরি মেরেছে। পরিচালক নীরেন লাহিড়ির উপর রাগ হল তাঁর। রাগ, না অভিমান? চোখে জল এল সুচিত্রার। বুঝতে পারলেন টালিগঞ্জে তাঁর কোনও বন্ধু নেই। তিনি একা এবং অসহায়। এবং সামনে অপেক্ষা করছে অবিরাম যুদ্ধ। এ-যুদ্ধে জয়ী হতেই হবে, রাগে-

অভিমানে চোখের-জলে দৃঢ় হলেন সুচিত্রা তাঁর সংকল্পে। আচ্ছা, উত্তম কি বঙ্গ হতে পারে না? নিশ্চয় পারে। ভারি মিষ্টি ব্যবহার ওর। কিন্তু খুব চাপা। মনের কথা প্রকাশ করে না। তা ছাড়া উত্তমও তো আমারই মতো নতুন, অনিশ্চিত, কেই বা চেনে ওকে, ইচ্ছে থাকলেও বঙ্গ হিসেবে ও কতটুকু সাহায্য করতে পারে? উত্তমের কথা মনে আসতে মেঘ কেটে মৃদু হাসি দেখা দিল সুচিত্রার চোখে। উত্তম-উত্তম, দু'বার চুপি-চুপি উচ্চারণ করলেন।

সকালে ঘূর্ম ভাঙল ফোনের ডাকে। পাহাড়ী সান্যালের ফোন। নায়িকার সংবাদ কী? পাহাড়ীর প্রশ্নে সুচিত্রা একটু হেসে বললেন, নায়িকার সংবাদ ভাল নয় পাহাড়ীদা। কাজৱীর “ওই ছোট রোলটা আমার নেওয়া উচিত হয়নি।”

—সুচিত্রা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর ক'দিনের মধ্যেই মুক্তি পাচ্ছে। এরপর তুমি যতদিন অভিনয় করবে, তুমই নায়িকা, তোমার ধারে কাছে কেউ নেই।

—কেমন করে জানলে?

—ছবিটা আমি দেখেছি। তুমই জীবার দেখা সব থেকে সুন্দরী নায়িকা। কোনও-কোনও দৃশ্যে তেমনকে দেখলে তোমার প্রেমে হাবড়ুবু না খেয়ে উপায় নেই। ছবিটা হিট করবেই। এবং হিট করবে তোমার জন্য।

পাহাড়ী সান্যালের কষ্টে এই গাঢ়তা সুচিত্রা আগেও লক্ষ্য করেছেন। পাহাড়ীদা বয়সে অনেক বড়। এই গাঢ়তা, আর্দ্রতার অর্থ সুচিত্রা বোঝেন। তাঁর গা ছমছম করে। অস্বস্তি লাগে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-র সেটে যখনই সুচিত্রা একটু একা, পাহাড়ীদা কাছে এসে কথা বলেছে, আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছে, সুচিত্রাকে বিশেষ ভাল লাগে। একদিন তো প্রেমের গান গেয়ে শোনাল। চমৎকার গলা। প্রাণের ভিতর থেকে উঠে আসে সুর। হঠাৎ সুচিত্রার মনে হল, পাহাড়ীদা ওই গানে নিজের মনের কথা জানাচ্ছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছবিতে পাহাড়ী সান্যাল নিত্যানন্দের ভূমিকায়। যখনই সুচিত্রার দিকে তাকিয়ে কথা বলে, মনে হয় না অভিনয় করছে। মনে হয়, তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠছে আদর। চৈতন্যের ভূমিকায় বসন্ত চৌধুরি কিন্তু তুলনায় অনেক দূরের মানুষ। সিনেমায় সুচিত্রা আর বসন্ত স্বামী-স্ত্রী, নায়ক-নায়িকা, অথচ পাহাড়ীকেই অনেক কাছের মানুষ মনে হয় সুচিত্রার। তাঁর ভয় করে। পাহাড়ীদাকে দুঃখ দিতে চান না সুচিত্রা। অথচ পাহাড়ী আর তাঁর মাঝখানে অদৃশ্য এক পাঁচিল তুলতে চান তিনি। সুচিত্রা জানেন, তাঁকে যেতে হবে অনেক দূর। এবং সে-যাত্রায় তিনি একা। শেষ পর্যন্ত কোনও

সঙ্গী নেই তাঁর। সবাইকে পিছনে ফেলে তাঁকে এগোতে হবে। কারও সঙ্গে কোনও সম্পর্কে আটকে গেলে চলবে না। কিন্তু উত্তম? উত্তমকে পিছনে ফেলে এগোবার কোনও প্রশ়ংস্য ওঠে না। সুচিত্রা উপলক্ষ্মি করেছেন, উত্তমকে সঙ্গে নিয়েই চলতে হবে তাঁকে। একজন ছাড়া অন্যজন নেই।

—দেবকীদা কী বলছেন? পরিচালক হিসেবে তাঁরও কি ধারণা ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হিট করবে, এবং হিট করবে আমার মতো সুন্দরী নায়িকার জন্য?

পাহাড়ী সান্যালের কথায় গলে না গিয়ে এইভাবে যেন অদৃশ্য পাঁচিল গাঁথার কাজটাই কিছুটা এগিয়ে দিলেন সুচিত্রা।

—দেবকীবাবু তো উচ্ছিসিত। বলেছেন, তোমরা দেখো, এ-মেয়ে অনেক দূর যাবে। বাংলা সিনেমায় এত বড় নায়িকা আর কখনও আসেনি, আসবেও না। তবে বস্তে থেকেও অফার আসবে ওর। চলে গেলে কিন্তু ভুল করবে।

—সত্যিই যদি বস্তে থেকে অফার আসে সে তো স্বেক্ষণ রূপকথা। না গিয়ে কী উপায়?

—আমাদের ছেড়ে কোথায় যাবে তুমি? সেখানে তোমার কোনও পাহাড়ীদা থাকবে না। মনে রেখো!

—চলার পথে আমি কেঁজ্বানও আটকে থাকতে চাই না পাহাড়ীদা। ভাগ্য যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানেই যাব। জানি, তোমরা আমাকে ভালবাস। কিন্তু কোনও ভালবাসার মধ্যেই তো চিরকাল আটকে থাকা যায় না। তুমই তো বলেছ, আমি অনেক দূরের যাত্রী। সে যাত্রাপথে সব সময়ে সঙ্গী পাব, এমন ভাবাটা উচিত হবে না।

দেবকী বসু এবং পাহাড়ী সান্যালের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে-অক্ষরে ফলে গেল। সুপারহিট হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। নায়িকার টানেই এ-ছবি বারবার দেখতে লাগলেন আপামর বাঙালি। ১৯৫৩ সাল। সন্ন্যাসী রাজেন্দ্রনাথ দে থাকেন উত্তর কলকাতার রামধন মিত্র লেনে। নিজেরই বাড়ির ছাদে একটি পাঠশালা চালান। সেখানে বিশেষভাবে ইংরেজি এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ান তিনি। নিজের অঙ্গে এবং হাতের ছিপছিপে বেতটির অঙ্গে তৈল মর্দন করতে-করতে তিনি সংস্কৃত আর ইংরেজি ব্যাকরণের পড়া ধরেন। শ্রী মারা যাওয়ার পর সন্ন্যাসী রাজেন্দ্রনাথ যাপন করেন কঠোর জীবন। ছাত্র পড়িয়ে নিজের নামমাত্র খরচ চালান। এহেন রাজেন্দ্রনাথ দেখতে গেলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এবং মায়ায়-মোহে-ভালবাসায়

পড়লেন বিষ্ণুপ্রিয়া-সুচিত্রার। প্রতিদিন দেখতে লাগলেন তিনটে এবং ছটার শো। মেয়েটি অসাধারণ, যেন স্বয়ং শ্রীরাধা, ওকে দেখলে না কেঁদে থাকতে পারি না, পাশের প্রতিবেশী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে বললেন আবেগপ্রবণ রাজেনবাবু।

—আমি আপনার সঙ্গে একমত, জানালেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। চলুন এক সঙ্গে আজই ছটার শোটা আরও একবার দেখি।

তিনটের শো সবে দেখে বাড়ি ফিরেছেন রাজেন্দ্রনাথ। ছটার শো আবার পরম উৎসাহে বীরেন্দ্রকে নিয়ে দেখতে গেলেন তিনি।

কেন যে বাড়ি ফিরে যান স্যার। তিনটে-ছটা একসঙ্গে দেখতে হলে বসে থাকলেই পারেন। রাজেনবাবুকে বললেন যে-ভদ্রলোক টর্চ জ্বলে রোজ অঙ্ককারে বসার জায়গাটা দেখিয়ে দেন।

প্রতিদিনই ভাবি, আর দেখব না। তা-ই বাড়ি ফিরে যাই। কিন্তু ফিরে আসি বিষ্ণুপ্রিয়ার টানে, বললেন সন্ধ্যাসী রাজেন্দ্রনাথ।

তগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মুক্তি পাওয়ার ত্রুটি সঙ্গের মধ্যেই সুচিত্রা সেন টের পেলেন সুপারহিট নায়িকার আঁচ কৃষ্টা গনগনে হতে পারে। কাজের চাপ বাড়তে লাগল তাঁর উপর। এছাড়া অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ। এবং ত্রুমাগত ভক্তদের ফোন। যার মধ্যে মধ্যবিষ্ট ও মধ্যবয়সি পুরুষের সংখ্যাই বেশি। সুচিত্রা বেশ জানেন পরের ছবি অগ্নিপরীক্ষা রিলিজ হওয়ার পর তাঁর ভক্তদের বয়েস অনেকটাই কমবে। তিনি প্রতিষ্ঠিত হবেন বাংলা সিনেমার অনন্য রোম্যান্টিক নায়িকা হিসেবে।

তগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পর সুচিত্রাই রাতারাতি বাংলা সিনেমার রাজকন্যা। তাঁকে নিয়ে প্রযোজক আর পরিচালকের উৎসাহের শেষ নেই। সকাল-বিকেল-রাত, তিন শিফটে শৃঙ্খিং করছেন তিনি। একটি ছবির শৃঙ্খিং শেষ করে আর এক ছবির শৃঙ্খিং-এ, একটা স্টুডিয়ো থেকে অন্য স্টুডিয়োতে। পরপর নটা ছবিতে সই করেছেন সুচিত্রা, সব ক'টি ছবির তিনিই মায়িকা : পরিচালক তরু মুখোপাধ্যায়ের অ্যাটম বম্ব ছবিতে নায়ক রবিন মজুমদার। পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায়ের চুলি-তে নায়ক প্রশান্ত কুমার। এছাড়া এক সঙ্গে শৃঙ্খিং চলছে— ওরা থাকে ওধারে, মরণের পরে, সদানন্দের মেলা, অন্নপূর্ণার মন্দির, গৃহপ্রবেশ, বলয়স্থাস আর অগ্নুত্ত অর্থাৎ বিভূতি লাহার ছবি অগ্নিপরীক্ষার। প্রত্যেকটার নায়ক উত্তমকুমার। সুচিত্রা-উত্তমের পর-পর সাতখানা ছবি মুক্তি পাবে ১৯৫৪-তে। ডুবলে তো ভরাডুবি। সুচিত্রা-উত্তম এক সঙ্গে তলিয়ে যাবেন। কিন্তু নরেশ মিত্রের

অনুপূর্ণার মন্দির, সুকুমার দাশগুণ্ঠর সদানন্দের মেলা, সতীশ দাশগুণ্ঠর মরণের পরে, অজয় করের গৃহপ্রবেশ, পিনাকী মুখোপাধ্যায়ের বলয়গ্রাস—কী সুন্দর গল্প সব, টানটান ছবি, হিট না হয়ে যাবে কোথায়? যদি সব কটা ছবিই কমবেশি লেগে যায়, তাহলে আমাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হবে না, সেই সঙ্গে উত্তমকেও, নিশ্চিত সুচিত্রা সেন। যতদূর চোখ যায় সুচিত্রার, যতদূর এই মুহূর্তে ভাবতে পারেন তিনি, সুচিত্রা-সুচিত্রা-সুচিত্রা, উত্তম-উত্তম-উত্তম। উত্তমকে সঙ্গে নিয়েই এগোতে হবে তাঁকে। তাঁকে ছাড়া উত্তমেরও গতি নেই। বাংলা ছবির নায়ক-নায়িকা বলতে এই মুহূর্তে উত্তম-সুচিত্রা, পরিষ্কার বুরতে পেরেছেন সুচিত্রা সেন। তুমি দেখে নিয়ো রমা, অগ্নিপরীক্ষা বুবিয়ে দেবে বাংলা ছবির রোম্যান্টিক নায়িকা একমাত্র তুমি, বলেছেন ছবির পরিচালক বিভূতি লাহা।

যত বাড়ছে কাজের চাপ, ততই জটিল হচ্ছে সুচিত্রার গৃহসমস্যা। স্বামী দিবানাথের সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবন ক্রমেই দুর্বিষহ। শান্তি নেই মুহূর্তের। তিনটে শিফটে কাজ করার পর অন্য দিনেও মতো সেদিনও অনেক রাত হয়েছে বাড়ি ফিরতে। সারা বাড়ি নিয়মিত কেউ জেগে নেই অপেক্ষা করে, পথ চেয়ে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে ভাবেন সুচিত্রা। মাঝে-মাঝে মনে হয়, হেথো নয় হেথো নয়, অন্য কেন্দ্র, অন্য কোনওখানে—নতুন ঠিকানায় বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে সুচিত্রার! নতুন ঠিকানা! ছোট দুটো শব্দে কেমন যেন একটা ডাক আছে। মনের গভীরে পৌছয় সেই ডাক। ক্লান্ত, আচ্ছন্ন চেতনায় ঢেউ ওঠে।

সিঁড়িটা যেখানে শেষবারের মতো পাক খেয়েছে, সেখানে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে দু-চোখ ভর্তি ঘূম নিয়ে মূনমূন।

—তুই ঘূমোসনি! মেয়েকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন সুচিত্রা।

—তুমি রোজ-রোজ অ্যাতো দেরি কর কেন? ছোট মুনমুনের গলায় ভিজে-ভিজে অভিমান।

—কী করব ডার্লিং? আমি হেল্ললেস। এই তো শ্যাটিং শেষ হল। মেকআপ পর্যন্ত তুলিনি। ছুটতে-ছুটতে চলে এসেছি।

—মা, তুমি অনেক বদলে গেছ। ইউ ডোন্ট মিস মি এনি মোর। হোয়াই আর'ন্ট ইউ লাইক ইজ ইউজড টু বি?

—দূর বোকা মেয়ে। আমি তো একই রকম আছি। আমার উপর কাজের প্রেশারটা অনেক বেড়ে গেছে। কতগুলো ছবির এক সঙ্গে শ্যাটিং চলছে জানিস?

—শ্যটিং আর শ্যটিং, অ্যাজ ইফ নাথিং এলস এক্সিস্টস! ইউ ডোন্ট থিক
অ্যাবাউট মি. ডু ইড?

—অফকোর্স আই ডু, অল দ্য টাইম। চল এবার শুভে চল। কাল তো
কুল আছে। অনেক ভোরে উঠতে হবে তোকে। এত রাত জাগলে শরীর
খারাপ হবে যে!

মুনমুন ঘুমিয়ে পড়ার পর অনেকক্ষণ মেয়ের পাশে বসে রইলেন
সুচিত্রা। শরীর ক্রান্ত, অথচ চোখে ঘূম নেই তাঁর। তাঁর কাছে একটি জিনিস
ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর লাইফস্টাইল পাল্টে গেছে। এবং পাল্টেছে
অতি দ্রুত। অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক সাফল্যের ফলে এই হঠাৎ
পরিবর্তন, প্রায় রাতারাতি। মুনমুন মায়ের জীবনে দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে
কিছুতেই মনিয়ে নিতে পারছে না। কষ্ট পাচ্ছে। মুনমুন হয়তো সামলাতে
পারত যদি বাবা-মায়ের সম্পর্কে চিঢ় না ধরত, ভাবলেন, সুচিত্রা। কী করে
সংসারের এই করুণ অবস্থার মধ্যে হাল টানবেন তিনি?

—মুনমুনকে আর কলকাতায় রাখতে চাই না আমি। আমি আমার কাজ
নিয়ে ব্যস্ত। তুমি আছ তোমার জগতে। শ্যটিংবস্থায় মেয়েটা ক্রমশই একা
হয়ে যাচ্ছে। ওর ওপর মানসিক চাপ হচ্ছে। সারাদিন ও আমাদের মিস
করে, এই বাড়িটার মধ্যে একাখন্কা ঘুরে বেড়ায়। স্বামী দিবানাথকে
ব্রেকফাস্ট-টেবিলে বললেন সুচিত্রা।

টোস্টের গায়ে মাখন শুধৃতে-মাখাতে দিবানাথ বললেন, তোমার ওই
শ্যটিং-ফুটিং বন্ধ কর, গেট ব্যাক টু ইউর ওল্ড ওয়েজ। সাকসেস হ্যাজ গট
ইন্টু ইওর হেড। অ্যান্ড আই ডোন্ট লাইক দ্য ওয়ে ইউ আর নাউ, আই
সিম্পলি হেট ইট। অ্যান্ড আই ডোন্ট লাইক দ্য সাইট অফ ইয়োর নিউ
অ্যাসেসিয়েটস। ভাবতে পারি না তুমি কী করে ওদের সঙ্গে মেলামেশা
কর।

—রাগারাগি চ্যাচামেচি করে কোনও লাভ নেই তুতু। এক সময়ে ছিল
তোমার পছন্দ-অপছন্দ, তোমার সব অন্যায় জেদ আমি মেনে চলতাম।
এখন সেদিন আর নেই। আমি একটা সমস্যার কথা তোমাকে বলতে
এসেছিলাম, যেটা তোমার-আমার দু'জনেরই সমস্যা। এবং এ-সমস্যার
সমাধান আমাদেরই করতে হবে, অন্তত সেটাই তো উচিত।

—মুনমুনের প্রবলেম তুমি ক্রিয়েট করেছ। কারণ, তোমার কোনও সময়
নেই ওকে দেবার মতো সময়। সুতরাং সমস্যাটা তোমাকেই সমাধান করতে
হবে।

—ঠিক আছে। আমিই করব। আমি মুনমুনকে বিলেতের স্কুলে পড়াতে চাই। ও এদেশে থাকলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। নতুন পরিবেশে, নতুন ডিসিপ্লিনের মধ্যে ও আমাদের হয়তো ততটা মিস করবে না।

—মাই গুডনেস! একেবারে বিলেতে? কেন, দেশের কোনও স্কুলে দিলে ঠিক হত না?

—নো নো। বিলেতের বোর্ডিং স্কুলে পড়বে সুচিত্রা সেনের মেয়ে। দ্যাট'স মাই ফাইনাল ডিসিশন।

সুচিত্রা বুরুলেন, মুনমুনকে বিলেতের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে দিবানাথের সঙ্গে আলোচনা করে লাভ নেই। যা করার তাঁকেই করতে হবে। কারও কাছে কোনও রকম সাহায্যের প্রত্যাশা না করে। তবে এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে আরও কিছুদিন ধৈর্য না ধরেও উপায় কোথায়? মুনমুন এখনও বড় ছোট। তা ছাড়া, ওকে বিলেতের স্কুলে পড়ানোর সব দায়িত্ব যদি নিজের কাঁধে নিতে হয়, তাহলে আরও বেশ কিছু হিট ছবির প্রয়োজন, আরও কাজ করতে হবে, যাতে প্রত্যেকের নিচে মাটি শক্ত হয়।

রাতের জানলার ধারে একা দাঁড়িজ্জে সুচিত্রার কানা পেল। রাতের আকাশ মেঘে ঢাকা। চাপা পড়েছে মাঝে, আকাশ ভর্তি তারা। মেঘের গায়ে লেগে আছে অস্তুত এক উজ্জ্বল সুস্ররতা। পারবে তো সুচিত্রা এতটা পথ একলা যেতে? পরপর হিট ছবির নায়িকা হতে? এমন একটা সময় কি সত্যিই আসবে যখন শুধু তাঁর জন্যই ছবি চলবে? টেলিউড উঠবে বসবে তাঁর আঙুলের ইশারায়? মেনে নেবে তাঁর সব শাসন, বায়না, দাবি? তিনি হয়ে উঠবেন অবিকল্প অদ্বিতীয় ম্যাডাম? মুনমুনের জন্যে এ-লড়াই তাঁকে জিততেই হবে। সুচিত্রা জানেন টেলিউডে সারাক্ষণ বইছে নিরঙ্কুশ পুরুষ-শাসনের অন্তর্ণ্রোত। অভিনেতা, পুরুষ-পরিচালক, পুরুষ-প্রযোজক—এরাই সর্বক্ষণ লাঠি ঘোরাচ্ছে। অভিনেত্রীদের তেমন কোনও জায়গা নেই যেন, তারা অনেক নিচের তলার জীব। সুচিত্রার মনে পড়ে কাননদেবীকে। সারা জীবন এই পুরুষ-শাসনের বিরুদ্ধে লড়েছেন কাননদি, খুব সামান্য অবস্থা, কৃৎসিত দারিদ্র্য থেকে উঠে এসেছেন নায়িকার মর্যাদায়। কাননদি শেষ পর্যন্ত জিততে পেরেছেন এমন একটা ভয়ংকর লড়াই যার মধ্যে হারিয়ে যান অধিকাংশ অভিনেত্রী, কিছুতেই উঠে আসতে পারেন না তাঁদের প্রত্যক্ষের অপমান, অর্মর্যাদা থেকে। কিন্তু কাননদি এ-লড়াই জিতেছেন শুধু নিজের জন্য, প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন স্বর্মর্যাদায়। তাঁর স্বীকৃতি আর মর্যাদার আলো পথ দেখায়নি অন্য অভিনেত্রীদের। বাংলা সিনেমায় পুরুষ-শাসনের বিরুদ্ধে

সুচিত্রার লড়াই শুধু নিজের জন্য নয়। আমি একদিন জিতবই, সকলের জন্য। টলিউডে অভিনেত্রীর অবস্থানে আমি আনবই আমূল পরিবর্তন, সুচিত্রা রাতের জানলার ধারে নিজের কাছে প্রতিশ্রুত হলেন। তাঁর মন থেকে মুছে গেল কান্না। সমস্ত ব্যথা বেদনা অভিমান অসহায়তাবোধ জমে পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল। মুনমুন অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি ধীরে এগিয়ে গেলেন খাটের কাছে। নিচু হয়ে চমু খেলেন মুনমুনের কপালে। কী সুন্দর দেখতে ছোট মুনমুনকে। ঠিক যেন একটা পুতুল ঘুমিয়ে আছে। বড় হয়ে মুনমুন যদি কোনও দিন সিনেমায় নামতে চায়? আতঙ্কে শিউরে উঠল সুচিত্রার মন। মুনমুনকে দূরে সরিয়ে দিতে হবেই।

সুচিত্রা মুনমুনকে গায়ের চাদরটা টেনে দিয়ে মেয়ের কপালের উপর আলতো করে হাত রাখলেন। মনে-মনে শুভ কামনা করলেন। তারপর শান্ত পায়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। প্রতি রাতের মতো আজও দিবানাথ ঘুমিয়ে। সুচিত্রা জানেন, ঘুমের শুধু খেয়েও তাঁর অনেকক্ষণ ঘুম আসবে না। বিছানার পাশেই একটি টেবিলের উপর রাখা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। সুচিত্রা পাতা ওল্টাতে থাকেন। রোজ কর্তৃতই কথামৃত পড়েন। পড়তে-পড়তে ঘুম এসে যায়। এক জায়গায় রামকৃষ্ণ বলেছেন, সুন্দরী পুজো কল্পুম। চোদো বছরের মেয়ে, দেখলুম সাক্ষাৎ মা। টাকা দিয়ে পেন্নাম কল্পুম। আর এক জায়গায় স্বামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, সত্য সত্যই কি ইশ্বর দর্শন করা যায়? বিবাহ, ছেলেপুলে হয়েছে, এতেও কি তাঁকে লাভ করা যায়? রামকৃষ্ণ উত্তর দিচ্ছেন, তাঁর কৃপা হলে কেন হবে না? এই জগৎ সামনে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, জীব, চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব। এ সব কী কল্পে হল? এর কর্তাই বা কে? আমিই বা তাঁর কে? এ না জানলে বৃথাই জীবন। কয়েকটা পাতা ওল্টালেন সুচিত্রা। তাঁর চোখ আটকে গেল এইখানে : দেখিতে দেখিতে নরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরের আনন্দের আর সীমা রহিল না। নরেন্দ্র ঠাকুরকে প্রণামের পর ভবনাথাদির সঙ্গে ওই ঘরে একটু গল্প করিতেছেন। কাছে মাস্টার। ঘরের মধ্যে লম্বা মাদুর পাতা। নরেন্দ্র কথা কহিতে কহিতে উপুড় হইয়া মাদুরের উপর শইয়া আছেন। হঠাৎ তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের সমাধি হইল। তাঁহার পিঠের উপর গিয়া বসিলেন। সমাধিষ্ঠ। ভবনাথ গান গাহিতেছেন, আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না, ও দু'টি চরণ বিনে আমার মন অন্য কিছু আর জানে না। ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। ঠাকুর মগ্ন হইয়া গাহিতেছেন, কখন কি রঙে থাক মা শ্যামা সুধাতরঙ্গী।

কথামৃত বন্ধ করে সুচিত্রা অনেকক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলেন। তারপর রোজ রাতের মতো আজও ঘুমের শুধু থ। এক-এক সময় ইচ্ছে হয়, সব ছেড়ে চলে যেতে। কিন্তু একটি মায়ায় আটকে আছেন। ছেট্ট মেয়ে মুনমুন। ওর জন্য যা কিছু করার, করবেন। চাই অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা। আরও অনেক লড়াই। এবং জিততে হবে। তারপর একদিন শেষ হবে শুধু, রাখা হবে সব প্রতিশ্রুতি, করা হয়ে যাবে সব কর্তব্য। সেনিন ছুটি। দিবানাথের দিকে তাকালেন সুচিত্রা। কত কাছের। এক খাটে সারা রাত। অথচ বড় দূরের। ক্রমেই ফারাকটা আরও বাড়ছে। দু'জনের পথ চলে গিয়েছে দু'দিকে। এক সঙ্গে থেকেও এই বিছেদ দু'জনের পক্ষেই কঠের। কিন্তু এই দ্রুত অনিবার্য, উপলক্ষি করেছেন সুচিত্রা।

এই দূরত্বের জন্য, কাছে থেকেও এই বিছেদের জন্য দিবানাথই কি সবটুকু দায়ি? তিনি ইচ্ছে করলেই কি হয়ে উঠতে পারতেন সুচিত্রার সব থেকে কাছের মানুষ? এ-প্রশ্নের পরিকার উত্তর সুচিত্রার জানা নেই। দিবানাথ আমার স্বামী, একান্ত মধ্যবিত্ত এক পরিবেশ থেকে সে আমাকে বিয়ে করে এনেছে, শুধু আমার জন্মের জন্য। অথচ, সে বিস্তার করতে পারেনি তার শাসন, তার আধিপত্য, তার নিয়ন্ত্রণ, দিনের পর দিন অনুভব করেছেন সুচিত্রা।

দিবানাথ সত্যিই অর্জন ক্ষেত্রে পারেননি সুচিত্রার অন্তরমহলে প্রবেশের অধিকার। সুচিত্রার সাফল্য, তাঁর অপ্রত্যাশিত জনপ্রিয়তা, তাঁর দিনরাতের ব্যস্ততা ক্রমশই তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছে দূরে, দিবানাথের নানান অধিকারের বাইরে, রচনা করেছে রহস্যময় অন্তরাল।

৩

সুচিত্রা বোঝেন, দিবানাথ যন্ত্রণা পাচ্ছেন। তাঁর মানসিক কঠের প্রধান দু'টি কারণ, আহত অহং এবং ঈর্ষাবোধ। সুচিত্রার জনপ্রিয়তাকে তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়া সহজ হচ্ছে না। কে দিবানাথ সেন? সুচিত্রা সেনের স্বামী। নিজের এই পরিচয় হয়ে উঠছে পীড়াদায়ক, অপমানজনক। অভিমানে অপমানে দূরে সরে গিয়েছেন দিবানাথ। তিনি কাছে আসতে চান না, এমন নয়। কিন্তু রোম্যান্টিক নায়িকার স্বামীর সে সুযোগ কোথায়? সুচিত্রাকে ঘিরে তৈরি হয়েছে পুরুষ-ভক্তদের এক ঘনিষ্ঠ বলয়। তা ছাড়া, উত্তমকুমারের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পর্কটাও খুব স্বচ্ছ নয় দিবানাথের কাছে। একের পর এক

হিট ছবির নায়ক-নায়িকা উত্তম-সুচিত্রা। ওদের প্রেমের ছবি দেখার জন্য বাঙালি পাগল। আপামর বাঙালির ওরা স্বপ্নের প্রেমিক-প্রেমিকা। বাজারে কত গল্প ওদের নিয়ে। দিবানাথের পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে উঠছে সুচিত্রা-উত্তমের এই রোম্যান্টিক ঘনিষ্ঠতা। সুচিত্রা প্রেম করছেন উত্তমকুমারের সঙ্গে, এমন কোনও নিশ্চিত প্রমাণ নেই দিবানাথের হাতে। যতটুকু জেনেছেন তার সবটাই গুজব। তবু বুকের মধ্যে টনটন করে। গলার শিরায় টান ধরে। আরও মদ খেতে ইচ্ছে হয়। মদ খেলেও ভোলা যায় না সেই কষ্ট। আচ্ছন্ন মনেও কঁটার মতো বিধে থাকে অপমানের যত্নণা, রাগ। প্রতিশোধের কথা ভাবেন দিবানাথ। কীভাবে প্রতিশোধ নেবেন তিনি? দিবানাথ বিশ্বাস করেন, তাঁর সকল কষ্টের মূলে সুচিত্রার ঝুপ। অ্যাসিড ছুড়ে... দিবানাথের ছোড়া অ্যাসিডের বোতল থেকে পলকে মুখ সরিয়ে নেন সুচিত্রা। ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসেন দিবানাথ। সুচিত্রা খাটের কোণে তখনও বসে। ঘুম নেই তাঁর চোখে। শান্ত কর্তৃ বলেন, আবার সেই ভয়ের স্বপ্নটা দেখেছ? দিবানাথ কোনও উত্তর দেননা। ঢক-ঢক করে খানিকটা জল গলায় ঢেলে দেন। সারা শরীর ঘৰে বেভজে গিয়েছে। ঘুম ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মনে হয়, রমা দু'দিন প্রয়োগ করে বসে যাবে। হিন্দি ছবিতে ডাক এসেছে তার। শরৎচন্দ্রের দেবদাস নিয়ে ছবি করছেন বিমল রায়। পার্বতীর ভূমিকায় সুচিত্রা সেন। দেবদাস স্বয়ং দিলীপকুমার। দেবদাস যদি লেগে যায়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। দিবানাথ নিশ্চিত, রমাকে আর কোনও দিনই ফিরে পাবেন না তিনি।

বিমল রায় আদিনাথ সেনের শ্যালক। অর্থাৎ দিবানাথের মায়া। বিমল রায়ের বোনকে বিয়ে করলেও বেশিদিন তাঁর সঙ্গে ঘর করতে পারেননি আদিনাথ, মহিলার অকাল মৃত্যুর কারণে। বিমলবাবু কিন্তু সম্পর্ক রেখেছিলেন আদিনাথের সঙ্গে, তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান দিবানাথদের সঙ্গেও। মামাশুণির হিসেবে সুচিত্রাকে স্নেহ করেন বিমল রায়। বিমল রায় দেবদাসের ভূমিকায় প্রথম থেকেই ভেবেছেন দিলীপকুমারকে। আর চন্দ্রমুখীর চরিত্রে বৈজয়ন্তীমালা। কে করবেন পার্বতী? প্রথমেই যাঁর কথা মনে এল বিমল রায়ের তিনি মীনাকুমারী। কিন্তু ব্যস্ত নায়িকা মীনাকুমারীর হাতে সময় নেই। অতএব মধুবালা। মধুবালা পার্বতী হলে আমি নেই, জানালেন দিলীপকুমার। বিমল রায়ের মনে পড়ল তাঁর সুন্দরী ভাগ্নেবউয়ের কথা।

বলিউড থেকে কোনও আকস্মিক আমন্ত্রণের কথা সুচিত্রার দূরতম কল্পনাতেও ছিল না। বস্তের ফিল্মজগৎ সম্পর্কে ছোটবেলা থেকে কত কথাই

না শুনেছেন তিনি। সে এক অনিশ্চিত, বিপদসংকুল পৃথিবী। অথচ বলিউড লোভনীয় স্বর্গও বটে, যেখানে সাফল্যের সীমানা আকাশ, যেখানে সম্ভাবনা অন্তহীন, যেখানে পৌছনো যেন অভিনয় জীবনের শেষ কথা, বিশেষ করে কোনও বাঙালি নায়িকার পক্ষে। তার উপর আবার স্বয়ং বিমল রায়ের ছবি, শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস দেবদাস নিয়ে। দেবদাসের পার্বতীকে কোন বাঙালি না চেনে, ভালবাসে, কোন বাঙালির হস্তয়ে নেই পারুর জন্য করুণা, বেদনা, রোম্যান্টিক সংরাগ? এমন এক চরিত্রে অভিনয় করার জন্য ডাককে কি ফিরিয়ে দেওয়া যায়? তা ছাড়া, নায়ক দিলীপকুমার। দিলীপকুমারের নায়িকা! টালিগঞ্জের আর কোনও বাঙালি অভিনেত্রী এ-স্বপ্ন দেখতে সাহস পাবে? এ-হেন অবাস্তব ঘটনা বাস্তব হতে চলেছে সুচিত্রার জীবনে, সহসা। কেমন যেন বিহুল লাগে সুচিত্রার। অথচ কিছুতেই যাচ্ছে না মনের ভার। মুনমুনকে একা ফেলে বসে পাড়ি—মনের মধ্যে অস্থির। ঘন হয়ে ওঠে পারিবারিক অশান্তি। এই তো শুরু। এরপর নিশ্চয় একের পর এক অফার আসবে হিন্দি ছবির। তখন কী হবে? সুচিত্রা নিজেকে বোঝান, অঙ্গীকৃত এলেই হ্যাঁ বলতে হবে, তার কী মানে? সবাই তো বিমল রায় নন। স্বাহা! দেবদাসের মতো ছবিও করছেন না। যে-কোনও হিন্দি ছবিতে শুধু মুসলিম টাকার জন্য আমি সই করব না, খুব ভেবেচিষ্টে হিন্দি সিনেমায় রাজি নন আমি।

বম্বেতে একা—এ-ডয়টেড ছিল সুচিত্রার মনে। তিনি জানেন তাঁর আকর্ষণ চুম্বকের মতো। পুরুষকে টানে। অয়চিতভাবে পুরুষ আসে। অধিকাংশই অবাঞ্ছিত। সে আর এক বিপদ। এদের হাত থেকে বাঁচার জন্য সুচিত্রা তৈরি করেছেন ব্যবহার এবং ব্যক্তিত্বের কাঠিন্য। অনেকে ভাবে তিনি অভদ্র। কিংবা বেজায় অহংকারী। উপায় নেই সুচিত্রার। এই আড়াল তিনি তৈরি করতে বাধ্য হয়েছেন।

—আপনাকে একলা যেতে হবে না ম্যাডাম। আমিও যাব আপনার সঙ্গে, বললেন ধীরেন।

—তুমি! আমি কিন্তু বেশ কিছুদিনের জন্য যাচ্ছি ধীরেন, পারবে অত দিনের জন্য কলকাতা ছেড়ে থাকতে?

—আপনার জন্য সব পারি ম্যাডাম। বম্বেতে আমার ডিউটি হবে আপনার ছবি তোলা। শুধু আপনার ছবি। আমার একমাত্র পরিচয় ম্যাডাম সুচিত্রা সেনের পার্সোনাল ফোটোগ্রাফার ধীরেন দেব।

ধীরেনকে বিশেষ ভাল লাগে সুচিত্রার। ভাল লাগার প্রধান কারণ, চমৎকার ছবি তোলে ছেলেটা। ভারি বিনয়ী। এবং ম্যাডাম বলতে অজ্ঞান।

প্রায়ই আসে স্টুডিয়োতে। যেখানে সুচিত্রার শ্যটিং সেখানেই ধীরেন। সুচিত্রা ছাড়া আর কারও ছবি তোলার দিকে মন নেই তার। সুচিত্রা শুনেছেন, হলিউডে বড়-বড় স্টারদের একজন করে ব্যক্তিগত ফোটোগ্রাফার থাকে। ধীরেন যেন অনেকটাই সে-রকম। ধীরেন জানে, আমার মুখের রাইট অ্যাপেলেটা ধরতে। ওর সব ছবিতেই আমাকে ভাল দেখায়।

ধীরেন অবিশ্য বলেন, ম্যাডাম, আপনার ছবি তুলতে কেন এত ভাল লাগে জানেন? আপনার চেহারায়, মুখের অ্যাপেলে, রং-অ্যাপেল বলে কিছু নেই। সব অ্যাপেলই রাইট অ্যাপেল। ক্যামেরা যেখানেই বসাই, সব কোণ থেকেই আপনি সমান সুন্দরী। আমার জীবনে এই প্রথম এমন একজনকে পেলাম। আপনার ছবি তুলতে কোথায় ক্যামেরা বসাব সে-ভাবনা ভাবতে হয় না। শুধু শাটার টিপলেই হল।

ধীরেন শুধু ছবিই তোলেন না। কত যে গল্প ওর স্টকে। দারুণ কথা বলেন। আর নানা রকম মজা করে হাসাতে পারেন। কালোর উপর ছেলেটাকে দেখতেও মিষ্টি। ধীরেনের সঙ্গে সহজে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে সুচিত্রার। তবে ধীরেন মাঝেমধ্যে বেয়াজ্জিত্বাবদার করেন। যেমন—একদিন, ম্যাডাম, আপনার গালে লিপস্টিক লিখে বড়-বড় করে ‘নো কিস’ লিখে ছবি তুলতে ইচ্ছে করছে।

—খ্যাপায়ি কোরো না ধীরেন। এ-ছবি আমি কিছুতেই তুলব না। কিন্তু এ রকম একটা অস্তুর ছবি তুলতে ইচ্ছেই বা হল কেন তোমার?

—পুরুষগুলো যে কত রকম ভাবে ম্যাডাম। অফিসে—আদালতে-বাজারে-ট্রামে-বাসে-ট্রেনে শুধু আপনার কথাই সারাক্ষণ আলোচনা করছে আর মনে-মনে জুলছে—

—কেন, জুলছে কেন?

—সে আমি আপনাকে বলতে পারব না ম্যাডাম, তবে যদি ছবিটা তোলেন, ওদের জুলুনি আরও বাড়বে।

—ছবিটা আমি একটা শর্তে তুলতে পারি। যাকে খুশি দেখাতে পার, কিন্তু কোনও দিন কোথাও ছাপাতে পারবে না, অন্তত আমি যতদিন বাঁচব, ততদিন না।

—আপনার আগে আমি মরতে চাই ম্যাডাম।

—কেন! তুমি তো আমার থেকে ছোট ধীরেন।

—তা হোক। আপনি না থাকলে বেঁচে থাকার কোনও মানে থাকবে না। কার ছবি তুলব?

হেসে ফেললেন সুচিত্রা। যে-রকম হইচই করে হাসেন তিনি। বলেন, যা মদ খাও তুমি, বেশিদিন বাঁচবে না, ডয় নেই।

বম্বেতে গিয়েও ধীরেনের বিদ্যুটে বায়না, সমুদ্রে চেউয়ের মধ্যে ম্যাডাম আপনাকে সুইমিং কস্টিউম পরে দাঁড়াতে হবে, শুধুমাত্র আমার ক্যামেরার জন্য।

—অসম্ভব ধীরেন, তোমার এই অন্যায় অনুরোধ আমি রাখতে পারব না। সরি।

—এটা অন্যায় অনুরোধ! আপনি যদি দক্ষিণ ফ্রান্সে যেতেন, সেখানেও সমুদ্রের ধারে ফ্রান্সের সেরা ফোটো-গ্রাফাররা আপনার এমন ছবি তোলার লোভ সামলাতে পারত না। সমুদ্র পাশে থাকলে পৃথিবীর যে-কোনও ফোটোগ্রাফারের চেয়েই আপনি জলদেবী। আপনার ধীরেন সেই ভিনাসের ছবি তুলতে চায়। ম্যাডাম, আপনি বলছেন অন্যায় অনুরোধ!

দারুণ সময় কাটল বম্বের সমুদ্রের তীরে। সুচিত্রা সুইমিং কস্টিউমে ফেনার মধ্যে, চেউয়ের সঙ্গে খেলছেন। আর ধীরেন ছবি তুলে যাচ্ছেন চেউয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে। তাঁর ক্যামেরার স্টিকিং যেন থামতেই চায় না।

—এবার বন্ধ কর। তোমার জলদেবী আর চেউ খেতে পারছে না, হাঁফিয়ে গেছে।

—চেউ খেলে খুব খিদে পড়িয়ে ম্যাডাম। বম্বের সমুদ্রতীরে দারুণ-দারুণ সি-ফুড পাওয়া যায়, চলুন, ট্রাই করি।

8

দেবদাস-এ কাজ করতে-করতে সুচিত্রা অভ্যন্ত হলেন বলিউডের কাজের পদ্ধতি এবং পেশাদার মনোভাবের সঙ্গে। গঞ্জের চেয়ে, পরমিদ্বা-পরচর্চার চেয়ে এখানে কাজ অনেক বেশি। ফাঁক এবং ফাঁকি অনেক কম। এ ছাড়া অর্থের জোরও অনেক বেশি। সব মিলিয়ে সুচিত্রার ভাল লাগল এই পরিবেশ। ভয়, দ্বিধা, সংকোচ, অনিশ্চয়তাবোধ কেটে গেল অনেকটা। মুনমুনের সঙ্গে রোজ অনেকবার টেলিফোনে কথা হয়। সে ভালই আছে। মনকেমন তো করবেই। কিন্তু দেবদাস-এ কাজ করতে ভালই লাগছে সুচিত্রার। ভাল লাগার একটা বড় কারণ দিলীপকুমার। অত বড় মাপের অভিনেতা। অথচ কোনও অহংকার নেই। সুচিত্রা অনুভব করেন, তাঁকে দিলীপকুমারের বিশেষ পছন্দ। একদিন তো বলেই ফেললেন, ইন ইউ আই

হ্যাভ কাম অ্যাক্রস ফর দ্য ফাস্ট টাইম অ্যান আইডিয়াল ব্রেন্ড অফ বিউটি অ্যাব ব্রেন্স। বৃক্ষিমতী সুন্দরী, তা-ই তো হতে চেয়েছেন সুচিত্রা ছোটবেলা থেকে। সেই স্বীকৃতি এল স্বয়ং দিলীপকুমারের কাছ থেকে।

—কিন্তু অধিকাংশ পুরুষ তো চান না যে সুন্দরী মেয়েটির বৃক্ষিটাও বেশ শান দেওয়া হোক। দেখেছি, সুন্দরীটি যদি সত্যিই বৃক্ষিমতী হয়, বেশির ভাগ পুরুষই অস্বস্তিতে ভোগে।

—বুঝতেই পারছেন, আমি সেই দলে পড়ি না। সুচিত্রার কটাক্ষের উত্তর দেন দিলীপকুমার।

—তার কারণ আপনি নিজে খুব বৃক্ষিমান মানুষ। এবং আপনার অভিনয় যেমন, আপনার ব্যবহারও তেমন। কোনও আড়ষ্টতা নেই। সেই কারণে এত সহজে আপনার বন্ধু হতে পারলাম। বিশ্বাস করুন, বন্ধে আসার ব্যাপারে আমার খুব ভয় ছিল। সেই ভয়ের অনেকটাই আপনার জন্য কাটল।

—তাহলে পরের ছবির অফার পেলে আপনার মধ্যে অতটা দ্বিধা-সংকোচ আর থাকবে না তো?

—পরের ছবি! দাঁড়ান, দাঁড়ান, আগে দেবদাস রিলিজ করুক।

—দেবদাস চলবেই। আবু প্রিটাও জেনে রাখবেন, হিন্দি ছবিতেও আপনি হিট। পরপর অফার প্রিপেন। ইচ্ছে করলে আপনি এখানে স্টেল করতে পারেন।

দিলীপকুমারের কথা মিথ্যে হয়নি। পরপর ছবির অফার এল। সব ছবির নায়িকা সুচিত্রা সেন। ছবিকেশ মুখার্জির মুসাফির, নন্দলাল জয়স্ত লালের চম্পাকলি, রাজ খোশলার বোম্বাই কা বাবু, শংকর মুখার্জির সারহাদ, অসিত সেনের মমতা, গুলজারের আঁধি। নায়কেরাও সব দিকপাল। মুসাফিরে শেখর; চম্পকলিতে ভরতভূষণ; বোম্বাই কা বাবু আর সারহাদ-এ দেবানন্দ, মমতায় সুচিত্রার দ্বৈত ভূমিকা, মা আর মেয়ে। মায়ের প্রেমিক অশোককুমার, কন্যার ধর্মেন্দ্র। আঁধিতে সঙ্গীবকুমার। বন্ধে দু-হাত বাড়িয়ে দিল। তবু সুচিত্রা বেছে নিলেন বাংলা সিনেমাকেই তাঁর প্রতিভা ও ভাললাগার একমাত্র ক্ষেত্র হিসেবে।

গভীর রাতে রোজ ধ্যান করেন সুচিত্রা। নিজেকে খোজেন সেই ধ্যানের মধ্যে। একটি দীপশিখা জুলে ওঠে তাঁর দুটি চোখের মাঝখানে। তিনি উপলক্ষ করেন, তিনি বেঁচে থাকবেন বাংলা সিনেমার শেষ রোম্যান্টিক নায়িকা হয়ে। বয়েসে কোনও দিন মলিন হবেন না তিনি। তাঁর সতেজ

যৌবন কোনও দিন বাঙালির রোম্যান্টিক স্বপ্ন থেকে মুছে যাবে না। তিনি চিরকালের, অনন্তযৌবনা, তাঁর কোনও ক্ষয় নেই, শেষ নেই। এমন একটা অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হবে কী করে, তা তিনি জানেন না। শুধু জানেন, বাংলা সিনেমা তাঁর ক্ষেত্র, নিয়ন্ত্রক ও নিয়তি। তিনি ইশ্বরকে জানান অন্তরের কৃতজ্ঞতা। সমর্পণ করেন নিজেকে। অবসান ঘটে দ্বন্দ্বের, সংশয়ের। প্রশ়ঙ্খ জায়গা করে দেয় প্রত্যয়কে।

সুচিত্রার সব বিশ্বাস, সব শান্তির উৎস পরমপুরূষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। যখনই মনে জাগে দিশাহারাভাব, বুঝতে পারেন না কী করা উচিত, বিপর্যস্ত হন মানসিক উদ্বেগে, একদিকে কাজের প্রাবল্য, অন্যদিকে সাংসারিক কর্তব্যের চাপ সামলাতে নাজেহাল মনে হয় নিজেকে, হৃদয়পাত্রে শান্ত চরণে এসে দাঁড়ান রামকৃষ্ণ। উক্তার করেন সুচিত্রাকে সকল সংকট থেকে। রামকৃষ্ণের এই কৃপা, করুণা সুচিত্রা কৃতজ্ঞ চিন্তে শ্মরণ করেন দিনেরাতে, পুণ্য প্রণামে সর্বদা নত হয়ে থাকে তাঁর মন। আর কারও কথায়, দীক্ষায় এমন শান্তি পান না সুচিত্রা, যা পান রামকৃষ্ণের কথামৃত থেকে। কত সহজে, কী অবিশ্বাস্য সাবলীল সারলেন্ডেসঙ্গে জীবনের জটিল সব প্রশ্নের উত্তর দেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হয় না। তাঁর কথা শুনলে মনে হয় তিনি খুব কাছের মানুষ, ঘরের লোক, এক মঙ্গলময় পরমাত্মায়। বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হল্লুশা! অর্থ তাঁর দিব্যদৃষ্টির সামনে উদ্ঘাটিত হয় সব সমস্যার সমাধান, তাঁর উচ্চারিত সত্য নির্যুল করে সব মিথ্যাকে, প্রশ়মিত হয় সংকোচ, সংশয়, সন্ধান। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এলে মনে হয় সব খোঁজা এবার শেষ হল। নিয়মিত পুজো করেন সুচিত্রা। তাঁর ঠাকুরঘরের শান্তি আটুট, নিটোল, সেখানে কাজের পৃথিবীর প্রবেশাধিকার নেই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে মনের কথা খুলে বলেন সুচিত্রা। বলেন মুনমুনের কথা, যেন মুনমুনের ওপর বর্ষিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ। বলেন স্বামী দিবানাথের কথা, প্রার্থনা করেন সাংসারিক শান্তি। তুই যদি সত্যি শান্তি চাস, অনেক ত্যাগের মধ্যে দিয়ে, অনেক একাকিন্ত্রের যন্ত্রণা সহ্য করতে-করতে দেখবি একদিন তুই আলোয় উত্তীর্ণ হয়েছিস, সেই পরম শান্তি তুই একদিন না একদিন অর্জন করবিই—শ্রীরামকৃষ্ণের এই নীরব আশ্বাস সুচিত্রা উপলক্ষ্মি করেন হৃদয়ে। রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়তে-পড়তে এক সময়ে ঘরের মধ্যে আর কেউ থাকে না, একা সুচিত্রা আর রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণ কথা বলেন সরাসরি সুচিত্রার সঙ্গে। একদিন বললেন, এই কথাটা সকল কাজের মধ্যে মনে রাখবি, তিনি যন্ত্রী তুই যন্ত্র। তিনি যেমন করান, তেমনি করিস। যেমন

বলান, তেমনি বলিস। প্রসাদ বলে ভবসাগরে বসে আছি ভাসিয়ে ডেলা, জোয়ার এলে উজিয়ে যাব, ভাটিয়ে যাব ভাটার বেলা। বাড়ের এঁটো পাতা কখনও উড়ে ভাল জায়গায় গিয়ে পড়ল, কখনও বা নর্দমায় গিয়ে পড়ল। বাড় যে দিকে লয়ে যায়। একদিন সুচিত্রা বললেন রামকৃষ্ণকে, ঠাকুর, আমি কিছু বুঝি না, তুমি বলে দাও ভগবান ঠিক কেমন। সুচিত্রার অন্তরের মধ্যে জুলে উঠল শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ সরল উত্তর, ঈশ্বরের স্বভাব বালকের মতো। বালক যেমন খেলা করে ভাঙে গড়ে, তিনিও সে-রকম সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। বালক যেমন কোনও শুণের বশ নয়, ঈশ্বরও তেমনি সন্তু রজ তম তিন শুণের অতীত। সুচিত্রা অনুভব করার চেষ্টা করেন ঠাকুরের বাণী। তারপর বিশ্বয়ে প্রশ্ন করেন, ঠাকুর, কী করে এত সহজ করে কঠিন প্রশ্নের উত্তর দাও তুমি? রামকৃষ্ণ হেসে উত্তর দেন, বিষয় বুদ্ধি ত্যাগ না করলে চৈতন্যই হয় না। ভগবান লাভ হয় না। বিষয়বুদ্ধি থাকলেই কপটতা হয়। সরল না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। সুচিত্রা ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করেন, তাহলে আমার কী হবে ঠাকুর? এত যে কাজ করছিও তো বিষয়সম্পত্তি, অর্থের জন্য। কাজ না করেও তো উপায় নেই। রামকৃষ্ণ উত্তর দেন, মনুমেন্টের নিচে যতক্ষণ, ততক্ষণ গাড়ি ঘোড়া থাকে মেম, এইসব দেখা যায়। উপরে উঠলে শুধু আকাশ, শুধু করছে তখন বাড়ি গাড়ি ঘোড়া মানুষ এসব আর ভাল লাগে না। এসব পিংপাত্তের মতো দেখোয়। তুই এখন মনুমেন্টের নিচে এসে দাঁড়িয়ে আছিস। কিন্তু নিচে না এলে উপরে উঠবি কী করে? অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে তো ওপরে ওঠা। তা এখন শুধু কাঠ পোড়ানোর পড় পড় শব্দ আর আগনের ঝাঁঝ। সব যেদিন শেষ হবে, শুধু ছাই থাকবে, তখন আর শব্দ নেই। আসত্তি গেলেই উৎসাহ যায়। শেষে শান্তি। গঙ্গার যত নিকটে যাবি ততই শীতল বোধ করবি। স্নান করলে আরও শান্তি। তেমনি ঈশ্বরের যত নিকটে এগিয়ে যাবি ততই শান্তি পাবি। শুধু সব কাজের মধ্যে মনে রাখবি একটি কথা, তিনি আছেন বলে সব আছে। তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না। ১-এর পিঠে অনেক শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায়। ১-কে মুছে ফেললে শূন্যের কোনও পদার্থ থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকেন সুচিত্রা। চোখ বুজলে মনের মধ্যে ফুটে ওঠে ওই ছবি। অন্ধকারে আলোর মতো। সুচিত্রা প্রশ্ন করেন, কত শান্ত, কত মন্ত্র, ঈশ্বর নিয়ে কত আলোচনা, এসবের তো কিছুই বুঝি না আমি, আমার পক্ষেও কি সম্ভব ঈশ্বরের কাছে যাওয়া? রামকৃষ্ণ উত্তর দেন, শুধু পড়লে শুনলে কী হবে? কেউ দুধ শুনেছে, কেউ

দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়। আবার তার সঙ্গে আলাপও করা যায়। যে শুধু পড়ে শোনে, সে শুধু প্রবর্তক, ঈশ্বর থেকে অনেক দূরে। সাধক হল যে তাঁকে ডাকছে, ধ্যান করছে, শুণকীর্তন করছে। আর যিনি সিদ্ধ, তিনি ঈশ্বরকে অনুভব করছেন, দর্শন করছেন। আর যিনি সিদ্ধের সিদ্ধ, যেমন চৈতন্যদেব, কখনও বাংসল্য, কখনও মধুরভাব। রামকৃষ্ণের কথায় সুচিত্রার শরীরের কাঁটা দেয়, চোখে জল আসে। রামকৃষ্ণের ছবিতে গলায় আঁচল দিয়ে দীর্ঘক্ষণ প্রণাম করেন তিনি। মাথায় যেন শ্রীরামকৃষ্ণ হাত রেখে বলেন, শোন মা, ঈশ্বরের উপর টান সকলের হয় না, আধার বিশেষে হয়। সংক্ষার থাকলে হয়। তোর মধ্যে সেই সংক্ষার আছে। একদিন দেখবি, তুই সব কিছু থেকে ছুটি নিছিস। এই যে তোর এত কাজ, এত নামভাক খ্যাতি প্রতিপত্তি, এত ভোগবিলাস, সব একদিন তুচ্ছ মনে হবে তোর, তুই একে-একে সব দরজা বন্ধ করে একা হবি, নিজেকে খুঁজবি, তখন ধীরে ধীরে অন্য দরজা খুলবে, তাঁর আলো আসবে তোর একা ঘরে।

একা ঘরে বসে সুচিত্রা ভাবেন, এইভাবে দোকা থাকার কোনও মানে হয় না আর। দিবানাথের সঙ্গে প্রতঙ্গে তেরি হচ্ছে নতুন দূরত্ব। দু'জনে যেন আলাদা গ্রহের মানুষ। দু'জনের মধ্যে একেবারে যে কথা বন্ধ, তা নয়। কিন্তু কথা হলৈই তেতো ক্ষুণ্ণ। সুচিত্রা যতদূর সম্ভব চূপ করে থাকেন। বাড়িতে থাকেনই বা কতটুকু। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একাধিক স্টুডিয়োতে চলছে একটির পর একটি ছবির শৃঙ্খিং। যখন অনেক রাতে ঝাস্ত হয়ে বাড়ি ফেরেন, তখন আর কথার উত্তরে কথা বলার এনার্জি থাকে না তাঁর। কোনও-কোনও দিন দিবানাথ জেগে থাকেন চোখে-মুখে তিরঙ্কার নিয়ে। তাঁর শরীরভাষার ইঙ্গিত, সুচিত্রার জন্যই যেন সংসারটা ছারখার হয়ে গেল। বাড়ির বউয়ের এসব মানায় না। এই মুহূর্তের সুচিত্রাকে বোৰা দিবানাথের সাধ্যাতীত। যে-মেয়েকে দিবানাথ বিয়ে করেছিলেন, আর যে-মেয়ে আজ সমস্ত বাঙালির মোহিনী, যাঁর জন্যে অজস্র হন্দয়ে এমন তুমুল তোলপাড়, তাঁরা কি এক মেয়ে? দিবানাথ কেন এই সত্যটুকুর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছেন না যে তিনি এ হেন ভারতবিজয়নী সুচিত্রা সেনের স্বামী হওয়ার অতুল গৌরবে অধিষ্ঠিত? কীসের সমস্যা তাঁর? তিনি তো সুচিত্রা সেনের স্বামী! অথচ তিনি চান সুচিত্রা সব ছেড়ে, তাঁর কাজ আর ব্যক্তিতার জগৎকে সম্পূর্ণ নিভিয়ে দিয়ে গৃহকোণের আলোয় শুধুমাত্র তাঁর হয়ে থাকুন। তা কী করে সম্ভব? সুচিত্রা যে-স্নাতের টানে দিবারাত্রি ভেসে

চলেছেন, সেই টানকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, তার অভিমুখ ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর নিজেরও কি আছে? আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী, যেমন বাজাচ্ছেন তেমনি বাজছি, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা মনে পড়ে সুচিত্রার। সুচিত্রা হয়ে উঠছেন অন্য কেউ, ঠাকুরেরই ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে সুচিত্রার মধ্য দিয়ে, এ-দায় সামলাবার ভারও তাঁর-ই। গভীর রাতে ঝাল্ট পায়ে পুজোর ঘরে ঢোকেন সুচিত্রা। নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেন শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে।

৫

—রোজ এত রাত পর্যন্ত কাজ? তুমি ভাব আমি এতই বোকা যে, যা আমাকে বোঝাবে তা-ই বুবুব, তা-ই বিশ্বাস করব? সুচিত্রা শুটিং সেরে ঘরে চুকতেই দিবানাথের সম্ভাষণ। আজ দিবানাথের জগে আছেন। একা বসে পান করছেন। সুচিত্রা উত্তর দেন না। জ্ঞেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। এত ঝাল্ট! তবু কী ভাল দেখছেছ তাঁকে! এই শ্রান্ত রূপসির দিকে তাকিয়েও কি দিবানাথের মায়া হয়ে আছে?

—চুপ করে থেকে ভেঙেছ পার পেয়ে যাবে? আজ একটা হেস্তনেস্ত করতেই জেগে আছি আমি।

—যা বলবার, কালকে বোলো। কাল সকালে অনেকক্ষণ বাড়ি থাকব। আজ থাক। বড় ঝাল্ট আমি।

—ও রকম অনেক কাল দেখিয়েছ। কাল সকাল হলেই তো ভজদের ফোন। তারপর তোমার নায়কের ফোন। আমার জন্যে সময় কোথায়? এভাবে আর কদিন চলবে?

—যতদিন তুমি চালাতে চাও।

—মানে?

—এর চেয়ে সহজ করে কী আর বলব বল?

—আলাদা হতে চাইছ?

—যদি মনে কর তা-ই, তবে তা-ই। তুমি যেভাবে চাইছ, সেভাবে আমাকে পাবে না। সম্ভব নয়। তোমার পক্ষে যদি সেটুকু মেনে নেওয়া শক্ত হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে যে-যার মতো থাকাই তো ভাল।

—তা-ই তো আছি। আর কী চাও?

—শান্তি চাই। বাড়ি ফিরে কোনও অশান্তি চাই না।

—তুমি যা খুশি করে বেড়াবে, আর আমি কিছু বলতে পারব না?

—আমি যা খুশি করে বেড়াচ্ছি না। আমি যা করি সেটাকে কাজ বলে।
সেই কাজে সাফল্যের জন্যেই আমি সুচিত্রা সেন।

—রেখে দাও তোমার কাজ। তোমার কাজের জন্যে সংসারটার কী
অবস্থা বোঝা?

—কী বলছ তুমি! তুমি বোধহয় ভুলে যাচ্ছ তুতু আমার কাজের, আমার
সাফল্যের একটা অর্থকরী দিকও আছে। এ-সংসারের বৈভব, বিলাস,
লক্ষ্মীশ্রী, সব কিছুর মধ্যে আমার উপার্জনের অবদানও কম নয়। আসলে
তুমি সেটাই সহ্য করতে পারছ না। তোমার ইগোতে লাগছে।

—তুমি সম্পূর্ণ ভুল বুঝছ আমাকে। তোমার উপার্জনের কোনও
প্রয়োজনই নেই এ-সংসারে। তোমার টাকা ছাড়াও দিব্য চলে যাবে
আমাদের।

—নিশ্চয় যাবে। কিন্তু এই যে আমি স্বাধীনতা অর্জন করেছি,
মুনমুনকে বাইরে পড়াবার কথা ভাবছি, নিজের মতো চলছি, এটাই তোমার
কাছে অসহ্য লাগছে।

—আমার অসহ্য লাগছে তোমার স্বেচ্ছাচার। যা-খুশি তা-ই করবার
অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে?

—কী করে বুঝলে আমি যা-খুশি তা-ই করছি?

—এই যে রাতদুপুরে বাড়ি ফিরছ, সারাদিন বাড়ির বাইরে, এটা কি যা-
খুশি তা-ই নয়? কোন স্বামী বরদাস্ত করবে?

—আমি রাত করে বাড়ি ফিরি নাইট শিফটেও শ্যুটিং থাকে বলে। এক
সঙ্গে তিন-চারটে ছবির শ্যুটিং চলছে। সাফল্যের দাম দিতে এই পরিশ্রম
এবং স্যাক্রিফাইস আমাকে করতেই হবে। আর সুচিত্রা সেনের স্বামী
হিসেবে তোমাকে এইটুকু মেনে নিতে হবে। বুঝছি কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সহ্য
না করে তোমার উপায় নেই। কিংবা উপায় আছে, যদি আমাকে ছেড়ে তুমি
নিজের মতো আলাদা হয়ে যাও।

—এত অহংকার তোমার? যদি পরপর তিন-চারটে ছবি ফুপ করে
কোথায় থাকবে এই অহংকার? তখন তো সুড়সুড় করে... মনে নেই বিকাশ
রায়কে নায়ক করে দুটো ছবি মেজো বউ আর ভালবাসা যখন ফুপ করল কী
অবস্থা তোমার! তোমার সাধের উত্তমকুমারকে নিয়ে সাঁঝের প্রদীপও তো
ফুপ করেছিল। তখন দেখেছি তোমার অবস্থা।

—ওই বছরেই বিকাশবাবুর সঙ্গে আরও একটা ছবি করেছি আমি। বিকাশই নায়ক। কিন্তু সাজঘর-এর নামটা তুমি করেই করলে না। কারণ সাজঘর-এর সাকসেস তুমি হজম করতে পারনি। পারনি উত্তমের সঙ্গে শাপমোচন ছবিটার সুপার সাকসেস গ্রহণ করতে। একই বছরে শাপমোচন এবং সবার উপরে। দুটোই সুপারহিট। দুটোই উত্তমের সঙ্গে। ভাবতে পার! আমার দিন ফুরতে এখন অনেক দেরি তৃতু। যেদিন মনে হবে রোম্যান্টিক নায়িকা হিসেবে দর্শক হয়তো আমাকে আর নিচে না, সেদিন আমি নিজে থেকেই সরে যাব। সে মনের জোর আমার আছে। কিন্তু তার আগে বাংলার হৃদয় আমি ভাসিয়ে দেব। এবং তুমি যদি সেই গৌরবের অংশীদার হতে না পার, তোমার পৌরুষে লাগে, আমি নিরপায়। এই সমস্যা সম্পূর্ণ তোমার। আমার নয়।

—হতে পার তুমি জনপ্রিয় অভিনেত্রী, তা বলে তুমি সংসার দেখবে না? ভুলে যাচ্ছ, তুমি গৃহবধূ। তোমার গৃহবধূ হিসেবে, আমার স্ত্রী হিসেবে, মূনমূনের মা হিসেবেও একটা ভূমিকা আছে। সেখানে তুমি কমপ্লিট ফেলিয়োর।

—আমি সংসার দেখি না তোমাকে কে বললে? এই সংসারে যেটুকু ডিসিপ্লিন আছে, তা আমার জন্যে। মূনমূনের লেখাপড়ার ওপর, ওর ভালমদ্দের ওপর কে নজর রাখে? সংসারটা যে ঠিক মতো চলছে, নিয়মিত সব কিছু হচ্ছে, তা কার জন্যে? কিন্তু এ-কথাটা তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, এক বছরে যদি নটা ছবি মুক্তি পায়, যেমন ১৯৫৪ সালে, আর ঠিক তার পরের বছর ছাটা ছবি, তাহলে সেই সব ক'টি ছবির নায়িকাকে সব সময়ে বাড়িতে পাওয়া যাবে, এমন ভাবাটা অসম্ভব চিন্তা। অন্যায়। বাংলা সিনেমার আর কোনও নায়িকার জীবনে এ-ঘটনা ঘটেনি তুতু। তবে এটাও ঠিক, এই পরিশ্রম আমিও আর পারছি না। এবার থেকে বছরে ছবির সংখ্যা কমিয়ে দেব।

—এ-কথা তুমি আগেও বলেছ। সে-লক্ষণ তো দেখছি না। তা ছাড়া ছবির সংখ্যা কমাও আর না কমাও, বাড়িতে তোমার আর মন বসবে না। বাইরের জগতের আছাদের স্বাদ পেয়েছ তুমি।

—ছবির সংখ্যা কমিয়ে দেব বললেই কমানো যায় না। আমাকে আর উত্তমকে ছাড়া প্রযোজকরা ভাবতে পারে না। একই বছরে সাগরিকা, একটি রাত, ত্রিয়ামা, শিল্পী। সব ক'টি ছবিতে আমি আর উত্তম। সব ক'টি সুপারহিট। এ তো নির্ভুল অঙ্কের হিসেব। তুমি সহ্য করতে পার না আর না পার।

—তোমার সঙ্গে উত্তমের সম্পর্ক, তোমাদের নিয়ে নানা গুজব, এ সব আমার সামাজিক পারিবারিক স্টেটাসের পক্ষে ক্ষতিকর।

—তুমি মিছিমিছি সন্দেহ করছ। এবং যন্ত্রণা পাচ্ছ। আমরা রোম্যাণ্টিক জুটি শুধুমাত্র পর্দায়। পর্দার বাইরে আমরা ভাল বন্ধু। তার বেশি কিছু নয়। তা ছাড়া উত্তম আমারই মতো বিবাহিত।

—বিবাহিত! বিবাহিত মানেই সাতখুন মাপ! বিবাহিত, অতএব তাকে নিয়ে আর সন্দেহ করার কিছু নেই। যদি তোমাদের মধ্যে কিসসু না থাকে, ও রকম মিষ্টি প্রেম-প্রেম ভাব পর্দায় সারাক্ষণ ফুটিয়ে তোলা যায়?

—সেই জন্যেই তো আমরা অভিনেতা-অভিনেত্রী। আমি তো প্রেমের অভিনয় বসন্ত চৌধুরির সঙ্গেও করেছি। বিকাশ রায়ের সঙ্গেও করেছি। সেখানে কি সুচিত্রা সেনের চোখে-মুখে-হাসিতে প্রেম ফুটে ওঠেনি? বিরহের কষ্ট, মিলনের আনন্দ, এ সব ঠিকমতো ফুটিয়ে তোলাই তো রোম্যাণ্টিক নায়িকার কাজ।

—এ-জিনিস দিনের পর দিন রাতের পর সন্তুষ্ট আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়।

—ওটা সম্পূর্ণ তোমার সমস্যা তুমি তুমি যদি মেনে নিতে না পার...

—আলাদা হয়ে যেতে বলছ তো?

—আমি কিছু বলছি না। তবে এইভাবে এক সঙ্গে থাকার চেয়ে আলাদা থাকা ভাল।

—ডিভোর্স?

—আমি একবারও বলিনি ডিভোর্সের কথা। তুমই শব্দটা প্রথম উচ্চারণ করলে। যাই হোক, আজ অনেক রাত হয়ে গেছে তুতু। আমি ঘুমের ওষুধ খেয়েছি। এবার ক্ষমা কর—আর তর্কবিতর্ক ভাল লাগছে না।

অনেক ভোরে ঘুম ভাঙল সুচিত্রার। বাগানে পাখির কলরব। ভোরের বাতাসে সবুজের সুবাস। তবু শরীর-মনে গ্লানি নিয়ে দিন শুরু হল সুচিত্রার। গত রাতের কথা মনে পড়ল তাঁর। দিবানাথের মনে যে তিক্ততা, বিদ্রে, হতাশা, রাগ জমে উঠেছে তা তর্কবিতর্কের পথে কোনও দিন শেষ হবে না। এর থেকে মুক্তির পথ বিচ্ছেদ। দূরত্বের মধ্যে হয়তো দু'জনেই ভাল থাকবেন।

শ্বান সেরে সুচিত্রা ঠাকুরঘরে ঢুকলেন। বাড়িতে আর কারও ঘুম ভাঙলার কোনও চিহ্ন নেই তখনও সব নিখাম শান্ত। এই সময়টিক সুচিত্রার

নিজের। প্রতিদিন এই সময়ে ঠাকুরঘরে আসেন সুচিত্রা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানে ভোরবেলা কাটে তাঁর। তাঁর ধ্যানে নেই কোনও মন্ত্রতত্ত্ব, কোনও নামজপ। আছে শুধু নিজেকে সম্পর্ণ। তাঁকে জানানো নিজের মনের কথা। তাঁর কাছে হৃদয় নিষেড়ে দেওয়া। প্রার্থনা করা। আর আছে কান্না। প্রার্থনার সঙ্গে মিশে যায় আর্তি। সুচিত্রার প্রার্থনা উঠে আসে তাঁর গহন যন্ত্রণা থেকে। ঠাকুর আমাকে পথ দেখাও। অঙ্ককারে আলো দাও ঠাকুর। উদ্ধার করো ঠাকুর আমাকে দিনরাতের গ্লানি থেকে। ঠাকুর, তুমি পথ না দেখালে আমি হারিয়ে যাব, নষ্ট হয়ে যাব। আমাকে সাহস দাও। একা থাকার সাহস। ঠাকুর, তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার। এই মুহূর্তে সব অঙ্ককার। আমি বুঝতে পারছি না কোন পথে যাব, কী করে বাঁচব। তোমার আলোয় আমার সকল আঁধার দূর হোক ঠাকুর।

সুচিত্রা যখন ঠাকুরঘর থেকে বেরোলেন, তখন বেশ বেলা। মনের ভার অনেকটা কেটেছে। ঠাকুর বোধহয় তাঁর প্রার্থনা শুনেছেন। অঙ্ককার সুড়ঙ্গের অনেক দূরে যেন আলোর আভাস। তাঁর আলো। ওই আলোর দিকে এগোতে হবে তাঁকে। একা।

ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়েই সুচিত্রা দেখলেন সামনে আদিনাথ। কোর্টের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

—আপনি এখনও বেরোবেন? শরীর ভাল তো বাবা?

—তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছিলাম বউমা। অন্যদিন তুমি অনেক সকালে বেরিয়ে যাও। তোমার সঙ্গে দেখা হয় না। আজ দেখলাম তুমি এখনও কাজে যাওনি। তা-ই ভাবলাম...

সুচিত্রার বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। যেন নিশ্চাস বন্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে। কথা বেরোল না তাঁর মুখ থেকে।

—ভয় নেই বউমা। আমি তোমাকে কোনওভাবে বাধা দিতে আসিনি। তুমি সিনেমায় নামার আগে আমার অনুমতি নিয়েছিলে। তোমার হয়তো মনে আছে, আমি বলেছিলাম, তোমার যদি প্রতিভা থাকে, আমি তোমাকে বাধা দেব না। তুমি তোমার প্রতিভার প্রমাণ দিয়েছ বউমা। তোমাকে বাধা দেবার প্রশ্নই আসে না।

সুচিত্রার চোখে জল এল। মুখে কথা সরল না। তাঁর গভীর কৃতজ্ঞতাবোধের সঙ্গে মিশে গেল হৃদয়ের গভীর বেদন। শ্বশুরমশাই কি বোরেন প্রতিদিন কী যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে তাঁকে?

—আমি জানি বউমা, তোমার চলার পথ সহজ নয়। অনেক বাধা-বিপত্তি, অনেক সমস্যার মধ্য দিয়ে তোমাকে এগোতে হচ্ছে। দিবানাথের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক যে ভাল নয়, নিষ্য অশান্তি লেগে আছে, তা-ও বুঝি। খুব চাপা স্বভাবের মেয়ে তুমি, কোনও দিনই কিছু জানতে দাও না। কিন্তু তুমি বল না বলে আমি জানি না, তা তো নয়।

সুচিত্রা মাথা হেঁট করে শুনছেন আদিনাথের কথা। শৃঙ্খরমশাই কতটা জানেন? খুব লজ্জা করল সুচিত্রা।

—তুমি আমার মেয়ের মতো। মনে রেখো তোমার কষ্ট আমারও কষ্ট। অথচ আমি নিরূপায়, কিছুই করতে পারছি না আমি। দিবানাথের সঙ্গে তোমার সমস্যাটা তোমাদের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেখানে আমার নাক গলানোটা কারও পক্ষেই সম্মানের হবে না। আমি আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে গেলে হয়তো আমাকে শেষ পর্যন্ত অপমানিত হতে হবে।

—আপনি দূরে-দূরে থেকে ঠিকই করেছেন। আপনার কোনও রকম অপমান আমি সহ্য করতে পারব না বাবা।

—মা, তুমিও নিশ্চয় বোঝো, হিকুনাথ ইনফিরিয়োরিটি কমপ্লেক্সে ভুগছে। ও তোমার সাফল্য, তোমার পঞ্জুলারিটি, প্রতিপত্তি, অর্থ এ-সব কিছু মন থেকে নিতে পারছে না। ইস্মির থেকে খারাপ অসুখ হয় না। দিবানাথ রাতদিন সেই অসুখের যন্ত্রণায় ভুগছে। তোমাকেও কষ্ট দিচ্ছে।

—বাবা, আপনি যে এখনও আমাকে এত ভালবাসেন, ভুল বোবেননি, সেটা যে জীবনের কাছে আমার কত বড় প্রাণি, আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।

—তোমাকে ভুল বোঝার কোনও প্রশ্নই আসে না। তুমি নিজের প্রতিভায়, নিজের কাজের জোরে এগিয়ে চলেছ। এইটুকু বুঝতে পেরেছি, তোমাকে বাধা দেবার ক্ষমতা আমাদের কারও নেই।

—ও যদি আপনার মতো করে আমাকে বুঝাত। কিন্তু ওর সে ক্ষমতা আছে বলে মনে হয় না।

—দিবানাথের পক্ষে তোমাকে বুঝে ওঠা কোনও দিনই সম্ভব হবে না। মা, তুমি তো আর পাঁচটা মেয়ের মতো নও। তোমার সাফল্য, তোমার ব্যক্তিত্ব এবং তোমার চাপা স্বভাব ওকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অনেকে তোমাকে অহংকারী ভাবে। তারা ভুল বোঝে। অহং না থাকলে, আত্মবিশ্বাস না থাকলে জীবনে কোথাও পৌছনো যায় না মা। তোমার মধ্যে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আছে বলেই সমস্ত বাধাবিপত্তি পেরিয়ে তুমি চলতে পারছ।

—বাবা, আমি জানি যা কিছু আমার জীবনে হচ্ছে, তা হচ্ছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দয়ায়। আর আপনাদের আশীর্বাদে।

—একটা কথা তুমি বোধহয় জানো না মা। তোমার অনেক ছবিই আমি দেখেছি। যেমন বিপাশা, সঙ্গপদী, চাওয়া-পাওয়া, স্মৃতিটুকু থাক। কেন লোকে তোমাকে এত চায়, কেন তুমি এত জনপ্রিয়, সেটা বুবাতাম না যদি না তোমার ছবি দেখতাম। মা, তুমি খুব বড় মাপের অভিনেত্রী। আমার মনে হয় না তোমার মতো সুন্দরী অভিনেত্রী বাংলা সিনেমায় কোনওদিন এসেছে।

—কী যে বলেন বাবা! আমি কিন্তু খুব লজ্জা পাচ্ছি। আপনি আমার এতগুলো ছবি দেখেছেন! বিশ্বাসই করতে পারছি না। কী যে আনন্দ হচ্ছে।

—দেশগুরু লোক তোমার জয়-জয় করছে, আমার সব বন্ধুবান্ধবই তো দেখি তোমার ফ্যান, তুমি তো বউমা টক অফ দ্য টাউন, আর আমি তোমার ছবি দেখব না! তা কী করে সম্ভব?

টক অফ দ্য টাউন? সুচিত্রার বুকের মন্ত্রিষ্ঠান করে উঠল। তাহলে কি শ্বশুরমশাই কোনওরকম কেচ্ছা, নিন্দা, স্কার্টালের কথাও শনেছেন? যে-সব রটনা নিয়ে দিবানাথ রাতদিন খোঝাপাইছে, সে-সব কথা কি আদিনাথের কানেও গেছে? আদিনাথ বুঝতে পারেন সুচিত্রার উদ্দেশ্য।

—আমাদের সমাজে এক্সট মেয়ে যদি তোমার মতো নাম করে, উন্নতি করে, অর্জন করে তোমারই মতো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, তাহলে তাকে সেই সাফল্যের মূল্যও দিতে হয়। তার নামে কিছু নিন্দা রটবেই রটবে, বিশেষ করে সে যদি হয় তোমার মতো সুন্দরী। মনে রেখো মা, আমাদের সমাজটা আফটার অল পুরুষশাসিত সমাজ। এখানে মেয়েদের জায়গাটা খুব ডেলিকেট। তাদের চরিত্রের ওপর কাদা ছুড়তে বিশেষ দেরি করে না এই সমাজ। সেই মেয়ে যদি তোমার মতো সিনেমায় নামে, তাহলে তো কথাই নেই।

—চিরদিন এরকম থাকবে না বাবা। আপনি দেখবেন। পরিবর্তন আসবেই।

—সেদিন কি আর আমি দেখে যাব মা? তবে যদি সত্যিই পরিবর্তন আনতে পার, আমাদের দেশের চেহারাটাই অন্য রকম হয়ে যাবে। আমার মাঝে মধ্যে মনে হয়, তুমি পারবে। তোমার মধ্যে সে মনের জোর আছে।

—সে-জোর ঠাকুর রামকৃষ্ণের জোর। তাঁর শক্তি ছাড়া আমার এক পা-ও হাঁটার ক্ষমতা নেই বাবা।

—তোমার এই বিশ্বাস আমাকে মুক্ষ করে। তুমি আরও অনেক দূর যাবে। তোমার বিশ্বাসই তোমাকে পথ দেখাবে।

—আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন বাবা।

সুচিত্রা প্রণাম করলেন আদিনাথকে। আদিনাথ আলতো হাত রাখলেন সুচিত্রার মাথায়। সুচিত্রা প্রাণভরে গ্রহণ করলেন আদিনাথের আশীর্বাদ।

হঠাৎ সুচিত্রার হাত ধরলেন আদিনাথ। শেকহ্যান্ডের ভঙ্গিতে। সেহে আর উষ্ণতা নিয়ে তাঁকে কাছে টেনে নিলেন।

—সুচিত্রা সেন, আই উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট।

সুচিত্রা সেন নামটি এমনভাবে উচ্চারণ করলেন আদিনাথ, ফুটে উঠল তাঁর হৃদয়ের মুক্ষতা। আদিনাথের মুখে সুচিত্রা সেন নামটি ওনে সুচিত্রার মনে হল, এই মুহূর্তে আদিনাথ তার শুশুর নন, বরং তাঁর একজন অভিজাত পুরুষ-ফ্যান। সুচিত্রা মজা পেলেন আদিনাথের সঙ্গে আকস্মিক অথচ মধুর দূরত্বে। আদিনাথের হাতটি গভীর আবেগে চেষ্টে ধরলেন তিনি।

সবে শেষ হয়েছে দুপুরের শিফট। রাতের শিফট তখনও শুরু হয়নি। সুচিত্রা-উত্তম দু'জনেই তুলে ফেলেছেন নিজেদের মেকআপ। স্টুডিয়োর মধ্যেই নির্জন পুকুরঘাট। গাছপালার ছায়ায় স্লিপ। শুটিংয়ের অবসরে ওঁরা পরম্পরের সঙ্গে নির্জনে কথা বলতে ভালবাসেন। সুচিত্রা-উত্তম বেশির ভাগ সময়েই আজড়া দেন পুকুরঘাটে। কিংবা স্টুডিয়োর কোনও নির্জন কোণে। কেউ সেদিক মাড়ায় না, পাছে তাঁদের নির্জনতা বিস্তৃত হয়, তাঁরা বিরক্ত হন। একটু আগেই তাঁরা অভিনয় করছিলেন ছবির শেষে ঘনিষ্ঠ মিলন দৃশ্য-যে-দৃশ্যটির জন্য অপেক্ষা করে থাকে বাঙালি দর্শক। ছবির শেষে এই মিলন দৃশ্য না থাকলে তাদের মন ভরে না। সব প্রযোজক, সব পরিচালক জানেন, সুচিত্রা-উত্তম নিয়ে হিট ছবির শর্তই হল ছবির শেষে একটি সুষমামণিত আদরের দৃশ্য, চোখে চোখ রাখা আদর, নিবিড় আলিঙ্গন। সুচিত্রা-উত্তমের এই নিবিড়তার মধ্যে বাঙালি নারী-পুরুষের স্বপ্নপূরণ। উত্তম চলে যাচ্ছেন চিরদিনের জন্য সুচিত্রার জীবন থেকে। সুচিত্রা হঠাৎ পথ আগলে বলবেন, যদি যেতে না দিই? উত্তম স্তিমিত গাঢ় কঢ়ে জিজ্ঞেস করবেন, জোর করে আটকে রাখবে? সুচিত্রা উত্তর দেবেন,

হ্যাঁ, জোর করেই। ব্যস, এইটুকু হলেই হল। বাঙালি দর্শক বাড়ি ফিরবে একটি সার্থক নিটোল রোম্যান্টিক স্পন্সর মুক্তি নিয়ে।

পুরুষাটোর যেখানটিতে ওঁরা বসেছেন পাশাপাশি, গাছের ছায়ায়, শুনশান দুপুরে শুধু পাতা ঝরার শব্দ।

—উত্তু, একটা কথা তোমাকে ক'দিন ধরেই জিজ্ঞেস করব ভাবছি। পায়ের কাছে ঘাস ছিঁড়তে-ছিঁড়তে নিচু-কঢ়ে বললেন সুচিত্রা।

—আর ভেব না। এবার জিজ্ঞেস করে ফেলো। বাতাসে উড়ে যাওয়া সুচিত্রার আঁচল সংযতে সুচিত্রার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে হাসতে-হাসতে বললেন উত্তম।

—হারানো সুর ছবিতে তুমি ওইভাবে ইনসিস্ট করলে কেন, নায়িকার নাম রমা রাখতেই হবে।

—নায়িকার নাম তো সত্যিই রমা। তা-ই। মজা করে উত্তর দিলেন উত্তম।

—আমার রমা নামটা লোকে ভুলে গেছে। উত্তমের হাতে হাত রেখে বললেন সুচিত্রা।

—আমি তো তোমাকে রমা বলেই জানি। অন্য কোনও নামে কোনও দিন ডেকেছি বলে তো মনে পড়ছেন না।

—তা ঠিক। স্টুডিয়োপাড়ায় আমাকে ওই নামে কেউ ডাকে না।

—কে ডাকবে বল? কারুবাড়ে ক'টা মাথা আছে। মিসেস সেনকে সবাই তয় পায়।

—আমাকে রমা নামে ডাকতে গেলে উত্তমকুমার হতে হয়। উচ্চস্বরে হাসলেন সুচিত্রা। সুচিত্রার এই দিলখোলা হাসি ভাল লাগে উত্তমের। এত প্রাণ, এত উচ্ছাস আর কোনও মেয়ের মধ্যে তিনি দেখেননি।

—আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম না কিন্তু।

—কোন প্রশ্ন?

—এরই মধ্যে ভুলে গেলে? হারানো সুরের নায়িকাকে রমা বলে ডাকতেই তোমার ইচ্ছে করল? রমা নামটা তো তেমন চমক লাগানো নাম নয় যে...

—এ-প্রশ্নের উত্তর কি না দিলেই নয়?

—ইচ্ছে না হলে দিয়ো না। আমি আর দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করব না।

—উত্তরটা তোমার জানা। তুমি এত বোকা নও যে বুঝতে পারনি।

—যদি বলি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই। সুচিত্রা চোখ রাখলেন উত্তমের চোখে।

- তুমি কিন্তু বিপজ্জনক জায়গায় পা রাখছ?
- যেখানে দেবদৃতেরাও পা রাখতে ভয় পায়? সুচিত্রার মুখে সেই হাসি যার মধ্যে ঝিলমিল করে ওঠে দুষ্টমি।
- সব বোঝ তুমি। তবু না-বোঝার চমৎকার ভান কর। রমা, তোমার সঙ্গে সময় কাটাতে কেন ভাল লাগে জান?
- আমি সুন্দরী। সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে কার না সময় কাটাতে ভাল লাগে?
- ওই ‘কার না’-দের মধ্যে উত্তমকুমার পড়ে না। তোমার সঙ্গে কথা বললে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে, মনে হয় পৃথিবীর সব সৌন্দর্য, সব শান্তি এখনও মরে যায়নি। দু-দণ্ড আশ্রয় পাই তোমার কাছে।
- বাড়িতে খুব ঝামেলা চলছে? গৌরীর সঙ্গে সম্পর্কটা ঠিক করে নেওয়া যায় না? সুচিত্রার কষ্টে মায়া, উদ্ধেগ।
- অসম্ভব। তা আর হয় না।
- তাহলে আলাদা থাকছ না কেন?
- থাকবে তুমি? তাহলে কালই সব ছেড়ে ছেলে আসি।
- কী যে বল! তা হয় না কি?
- কেন হবে না।
- তাহলে আর আমাদের ছানি কেউ দেখতে আসবে না। সব রোমান্স উড়ে যাবে, বুঝলে উত্তমকুমার!
- সুচিত্রা সেনের কী বুদ্ধি!
- উত্তমের কথায় আবার হই-হই করে হেসে উঠলেন সুচিত্রা। সে হাসির মধুর আওয়াজ পুরুরের জলে ভাসতে-ভাসতে ওপারে গিয়ে ভিড়ল।
- তোমার বাড়ির খবর কী? দিবানাথবাবুর সঙ্গে কোনও রকম বোঝাপড়ায় পৌছতে পারলে?
- তোমারই মতো আমার অবস্থা। বাড়িতে শান্তি নেই। এইভাবেই চলবে। কতদিন জানি না।
- কী আশ্র্য দেখ। দু’জনেরই সংসার কেমন যেন হয়ে গেল। বাড়িতে কোনও ভালবাসা নেই। যা চাইলাম তা পেলাম না। অথচ রোম্যান্টিক প্রেমিক-প্রেমিকা বলতে বাঙালি দর্শক আমাদেরই বোঝে।
- মানুষ যা পায় না তা-ই তো চায় উত্তু। তোমার-আমার ভালবাসা, ঘনিষ্ঠতার মধ্যে ওরা যা পায়নি তা-ই দেখতে পায়। পর্দায় আমাদের দেখে ভাবে আমাদের জীবনেও ওই রকম যদি হত!
- তাহলে তো ভারি অন্যায় করছি আমরা।

—অন্যায় কেন?

—মানুষকে ভুল স্বপ্ন দেখাচ্ছি। ভুল পথে, ভুল ধারণার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছি।

—তাহলে তো সমস্ত রোম্যান্টিক সাহিত্য, প্রেমের কবিতা, গান, সবই অন্যায়। যা বাস্তবে ঘটে না, তা-ই ঘটে ভালবাসার গল্পে কবিতায় গালে। তুমি আমি মানুষকে যে-স্বপ্ন দেখাচ্ছি, তার মধ্যেও সত্যি আছে উত্ত। সত্যি না থাকলে মানুষ আমাদের এভাবে গ্রহণ করত না।

—যিখ্যে সাজানো গল্প সব। তার মধ্যেও সত্যি আছে?

—সত্যি না থাকলে হারানো সুর-এর শেষ দৃশ্যে তুমি আমাকে ওইভাবে রমা রমা বলে ডাকতে-ডাকতে আমার দিকে ছুটে আসতে পারতে?

কথাটা বলার পর সুচিত্রা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। উত্তমও তখনি কোনও কথা খুঁজে পেলেন না। একবার শুধু হাত রাখলেন সুচিত্রার হাতে।

—এই তো কেমন ভাল মেয়ে। নিজের প্রশ্নের উত্তর তুমি নিজেই দিয়ে দিলে। কঢ়ে আলতো মজার ভাব এনে বললেন উত্তম।

—না দিয়ে উপায় কী? তোমার অহংকার। কিছুতেই তো তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না।

—অহংকার নয় রমা। তুমাকে আমি খুব ভালবাসি বলেই বিপজ্জনক প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলাম।

—ভালবাসার কথা সরাসরি না বলাই ভাল। শব্দটা অতি ব্যবহারে নষ্ট হয়ে গেছে। উত্ত, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ?

—কী?

—তোমার আমার ছবিতে গাঢ় প্রেমের দৃশ্যেও আমি তোমাকে ভালবাসি, এই কথাটা কখনও থাকে না!

—থাকে না বুঝি?

—না, আমি তোমাকে কখনও বলিনি আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমিও বলনি, তুমি আমাকে ভালবাস। আমাদের ভালবাসা চোখেমুখে, পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে ভঙ্গিতে ফুটে ওঠে। সরাসরি প্রেমের কথা আমরা কখনও বলি না। অথচ দৃশ্যের পর দৃশ্যে প্রেমের ইঙ্গিত, আভাস থাকে।

—তুমি বলছ আমরা ইচ্ছে করে বুঝেগুনে এসব করি?

—এটাও কিন্তু বিপজ্জনক প্রশ্ন উত্ত। আমি কিন্তু এড়িয়ে যাচ্ছি না। না উত্ত, এসব কিছুই আমরা সচেতনভাবে করি না। তোমার-আমার অভিনয়ে

যে ভালবাসা ফুটে ওঠে, সেটা সত্যি। যদি বলি আসলে আমরা অভিনয়ই করি না।

—রমা, যেরকম চলছে চলুক না। কী লাভ এইসব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে। আমাদের ভালবাসা তো আমাদের এ-জীবনে কোথাও পৌছে দেবে না।

—কোথায় পৌছতে চাও?

—তুমি তো বলেই দিয়েছ, সেখানে পৌছলে আমাদের ছবি কেউ আর টিকিট কেটে দেখতে আসবে না।

উত্তম-সুচিত্রা দু'জনেই হো-হো করে হেসে উঠলেন। দমকা বাতাসে হঠাৎ উড়ে যাওয়া আঁচলটি জড়িয়ে নিলেন সুচিত্রা।

—উত্তু, আমাদের অধিকাংশ ছবিই মিলনে শেষ হয়। আমাদের বিচ্ছেদ দর্শক নিতে পারে না। অথচ, আমি নিশ্চিত, ব্যক্তিগত জীবনে আমরা যদি এক হই, সেটাও দর্শক নিতে পারবে না। আমাদের দর্শকের সংখ্যা অবশ্যই কমবে। আমাদের প্রেমে, বিচ্ছেদ-মিলনের মধ্যে যে রোমাঞ্টা দর্শক এনজয় করে সেটা আর থাকবে না।

—হয়তো ঠিক বলছ। একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। ধরো হারানো সুর ছবিটা। কিংবা চাওয়াপাওয়া। ছবির শেষে সব বিচ্ছেদের সমাপ্তি। তোমার আমার প্রেম স্বাধীক হচ্ছে। আমরা এক হচ্ছি। কিন্তু তারপর? তারপর কী হচ্ছে আমাদের? এক সঙ্গে থাকতে-থাকতে আমাদের রোম্যান্টিক প্রেম কি এক সময়ে ছিবড়ে হয়ে যাচ্ছে না?

—আমাদের মিলনটাই সব। সেখানেই গল্প শেষ। তারপরে আমাদের কী হল, মারামারি কাটাকাটি ডির্ভেস হল কি না সে বিষয়ে দর্শকের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। সেটাই কিন্তু স্বাভাবিক। আমরা দর্শকের কাছে রোম্যান্টিক প্রেমের প্রতীক। চিরদিনের রোম্যান্টিক প্রেমিক-প্রেমিক। দর্শক কিন্তু আমাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে দেখতে চায় না।

—রমা, হারানো সুর-এ কিন্তু আমরা স্বামী-স্ত্রী...

—তা ঠিক। কিন্তু স্বামীটি স্ত্রীকে চিনতে পারছে না। তুমি কিন্তু ওই ছবিতে আমাকে সারাক্ষণ পরস্তী ভেবে দূরে সরিয়ে রাখছ। অথচ আমার প্রতি ক্রমশই তোমার মধ্যে দেখা দিচ্ছে দুর্বলতা। এটা স্বাভাবিক স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নয়। তা-ই দর্শক ছবিটা দারণভাবে নিয়েছে।

—রমা, তুমি বলছ সুচিত্রা-উত্তম বাস্তব জীবনে স্বামী-স্ত্রী হলে...

—উত্তু, ও কথা ভাবলেও পাপ। তুমিও ডুববে, আমিও ডুবব। দর্শক আমাদের মুহূর্তে রিজেক্ট করবে।

—রমা, আমাদের ভালবাসা...

—ভালবাসতে কে বারণ করেছে। ভালবাসা বেঁচে থাকে বিরহে, বিচ্ছেদে। প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রয়োজন দূরত্বের। তোমার আমার বাড়ির জীবনের কথা ভাব তো! থাকল ভালবাসা?

—তুমি আমাকে মিস কর না রমা?

—করি।

—কী মনে হয় তখন?

—তোমাকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে।

—কেন?

—ধর বৃষ্টি এসেছে মুষলধারে। মাঝরাতে। বৃষ্টির শব্দ শুনছি। অথচ ঘুমের মধ্যেও রয়েছে। তখন মনে হয়, যদি তুমি কাছে থাকতে, এই অস্তিত্ব ভাললাগার আচ্ছন্নতাটা শেয়ার করতে পারতাম। ভোরবেলা যখন ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াই আকাশে আন্তে-আন্তে আলো ফোটে। তোমাকে মনে পড়ে। তুমি নিশ্চয় তরুম ঘুমোও।

—মিস করলে আমার খুব কষ্ট হয়। রুকের মধ্যে টনটন করে। কিছু ভাল লাগে না।

—কাকে মিস কর?

—ওইভাবে কষ্ট পেতে ক্ষিত্ত ভালও লাগে রমা।

—আমার জন্যে কষ্ট পাও?

—মনে হয় বাড়িঘর ছেড়ে, সব কিছু চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি, চলে আসি।

—তোমার কাছে?

—হয়তো একদিন সত্যিই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব। ভালবাসার নতুন ঠিকানা আমাকে খুঁজে পেতেই হবে।

—উত্তু, একদিন তুমি নতুন পথ খুঁজে পাবেই। আমার পথ তোমার পথ হয়তো এক হবে না। কিন্তু আমরা পরম্পরারের কাছে প্রেমের থেকেও বেশি কিছু পেয়েছি।

—প্রেমের থেকেও বেশি কিছু।

—হ্যাঁ উত্তু, বস্তুত্ব! হয়তো একদিন...

—হয়তো একদিন কী রমা?

—একদিন হয়তো আমরা পরম্পরারের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যাব। আমি হয়তো নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নেব, সব কিছু থেকে। কোনও

প্রেম, কোনও ভালবাসার আর প্রয়োজন হবে না আমার। আমি নিজেকে সমর্পণ করব অন্য কাউকে। বলতে পার, সেটা এক ধরনের শ্বেচ্ছান্বিতাসন। তুমি থাকবে তোমার কাজের জগতে, আরও সফল, আরও গৌরবের অধিকারী হয়ে। আমি দূর থেকে দেখব। একটা কথা মনে রেখো উত্তু, প্রেম ফুরিয়ে যায়। বস্তুত্ত বেঁচে থাকে। দূরে সরে গিয়েও আমি তোমার প্রিয় বাঙ্কবী থাকব চিরকাল।

—হঠাতে দূরে যাবার কথা উঠল কেন বুঝলাম না। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেকেন্ড শিফটের শ্যুটিং শুরু হবে। শুরুতেই তো আমাদের রোম্যান্টিক দৃশ্য।

—আগামী সপ্তাহে এ-সময়ে আমি বিলেতে। তাই হয়তো মনটা দূরত্বের কথা ভাবছে।

—সব ঠিক হয়ে গেছে?

—হ্যা, মুনমুনকে সারে-র একটা কুলে ভর্তি করেই চলে আসব। দিন দশবারো আমি নেই।

—দিন দশবারো!

—তোমার তো ভালই। অন্য মাসিকাদের সঙ্গে...। শোনো, যাই কর সাবধানে কোরো। সব খবর পাবেক্ষত্ব।

—ধারে-কাছে কেউ নেই একেবারে খাঁ-খাঁ। তুমি যা ভাব তা নয়। ক'দিন পুকুরপাড়ে একলাই বসে থাকব।

—উত্তু, ওঠা যাক এবার। মেকআপ নিতে হবে। কথায়-কথায় একটু দেরিই হয়ে গেছে। ভাল কথা, একলা পুকুরপাড়ে উত্তমকুমার! একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না?

৭

মুনমুনকে বিলেতের কুলে ভর্তি করে ফিরে আসার পর নিজেকে যেন আরও গভীরভাবে সমর্পিত মনে হল সুচিত্রার। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে সমর্পিত। মুনমুন নেই। বাড়িটা একেবারে ফাঁকা। এ-বাড়িতে মন বসানো অসম্ভব। এ-সংসার তাঁর নয়, মনে হয় সুচিত্রার। নিজের বাড়িতে যেন তিনি পরবাসী।

একমাত্র ঠাকুরঘরে শান্তি পান তিনি। ঠাকুর রামকৃষ্ণের অশেষ করণে যেন বর্ষিত হয় তাঁর যন্ত্রণার উপর। ভাবেন কবে ছুটি পাব প্রাত্যহিক পৃথিবী

থেকে, কবে সমস্ত কাজ আর কর্তব্যের শেষে তিনি এসে দাঁড়াবেন জীবনের মাঝখানে। কবে তাঁকে সব দিয়ে মুক্ত হব। কিন্তু ঈশ্বর না টানলে তাঁর কাছে কি যাওয়া যায়? তাঁকে সব উৎসর্গ করা যায়? সুচিত্রার মনে প্রশ্ন। ঠাকুরঘরে শ্রীরামকৃষ্ণকে ধ্যান করছেন সুচিত্রা। ধ্যানের মধ্যে জেগে ওঠে এই প্রশ্ন। ধ্যানের মধ্যেই সুচিত্রা পান শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর :

—কখনো ঈশ্বর চুম্বক হন ভক্ত ছুঁচ হয়। আবার কখনো ভক্ত চুম্বক হয়, ঈশ্বর ছুঁচ হন। এইভাবে একবার ঈশ্বর ভক্তকে টানছেন, একবার ভক্ত ঈশ্বরকে টানছেন।

—তাঁর প্রতি অমন টান প্রাণে আসবে কী করে ঠাকুর? তুমিই তো আমার ঈশ্বর ঠাকুর। কী করে তোমাকে কাছে টেনে নেব? চুম্বক হব কী করে? সুচিত্রার প্রশ্ন।

—ঈশ্বরের বারবার অবর্তীর্ণ হয়ে ভক্তির উপদেশ দেন। শরণাগত হতে বলেন। ভক্তি থেকে তাঁর কৃপায় সব হয়। জ্ঞান বিজ্ঞান সব। তিনি ধরা দেন।

—ঈশ্বরের কাছে যাব কী করে ঠাকুরকে নিয়ে যাবে, কে পথ দেখাবে? সুচিত্রার মনে আরও প্রশ্ন।

—শ্রীকৃষ্ণ একদিন যশোদাকে বললেন, তোমাদের নিত্যধাম দর্শন করাব। এসো যমুনায় স্নান করতে যাই। তাঁরা যেই ডুব দিয়েছেন অমনি একেবারে গোলক দর্শন। তারপর অথও জ্যোতি দর্শন। যশোদা তখন বললেন, কৃষ্ণ, ওসব আর দেখতে চাই না। এখন তোর সেই মানুষরূপ দেখব। তোকে কোলে নেব, খাওয়াব। তা-ই জানবি, অবতারে তিনি বেশি প্রকাশ। অবতারকে সকলে চিনতে পারে না। দেহ ধারণ করলে রোগ, শোক, ক্ষুধা, ত্বক্ষণ সবই আছে। মনে হয় আমাদেরই মতো। তুই আমাকে চেনবার, বোঝবার চেষ্টা কর। আমি তোকে অঙ্ককার থেকে আলোয় নিয়ে যাব। আমাকে যখন ধ্যান করবি, তখন ভাববি তোর দেহটা একটা লর্ণ, ভিতরে আলো জ্বলছে।

—আমি যে ঠাকুরঘর থেকে বেরোই সব কেমন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তখন শুধু কাজ আর কাজ। শিকড়েবাকড়ে জড়িয়ে আছি। তুমি যেভাবে বল ঠাকুর সেভাবে চলতে পারি কই? সুচিত্রা অসহায়ভাবে প্রশ্ন করেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে। শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর শুনতে পান ধ্যানের গহনে।

—মনে রাখবি, এই যে শিকড়েবাকড়ে জড়িয়ে আছিস, কাজ করছিস, সবই তিনি। তোর কাজ তিনি করছেন। এই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় রাতদিন হচ্ছে

তাঁর শক্তি। আদ্যাশক্তি আর ব্রহ্ম অভেদ। ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তি হয় না। যেমন জলকে ছেড়ে তরঙ্গ হয় না। তুই যে তরঙ্গের মধ্যে আছিস তা তো জলেরই অঙ্গ। যতক্ষণ তিনি লীলার মধ্যে রয়েছেন, ততক্ষণ দুটো বলে বোধহয়। শক্তি বললেই ব্রহ্ম আছেন। যেমন জ্ঞানবোধ থাকলে অজ্ঞানবোধও আছে। সবেতেই তিনি। তাঁর কাছ থেকে বেরোবার পথ নেই। তুই যে কাজ করিস তা তো তাঁরই প্রকাশ। তিনি নিরাকার। কিন্তু সাকার হয়ে আছেন। এতে আমাদের বড় সুবিধে। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। বাক্যমনের অতীত যিনি, তিনি নানারূপ ধরে অবর্তীণ হয়ে কাজ করছেন। ওঁ থেকে ওঁ শিব, ওঁ কালী, ওঁ কৃষ্ণ হয়েছেন। তোকে একটা উদাহরণ দিই। তাহলে আরও ভাল করে বুবিবি। নেমন্তন্ত্র বাড়িতে কর্তা একটা ছোট ছেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তার কিন্তু কত আদর, কেন বল তো? সে শুধু ওঁ নয়। সে এখন অমুকের দৌহিত্র, অমুকের পৌত্র, অমুকের পুত্র। কতভাবে সাকার হয়েছে ওই ছোট ছেলে!

—কিন্তু বীজমন্ত্র না পেলে কি তাঁর কৃষ্ণ পৌছনো যায়? সুচিত্রার মনে আরও এক প্রশ্ন। শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির দেশকে তাকিয়ে থাকেন সুচিত্রা। তাঁর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে ক্রতৃজ্ঞতার কান্নায়।

—শুধু বিশ্বাসে তাঁর কৃষ্ণ পৌছনো যায়। বিশ্বাস করবি, কারুকে, কোনও মতকে বিদ্বেষ করবি না। নিরাকারবাদী, সাকারবাদী সকলেই তাঁর কাছে যাচ্ছে, জ্ঞানী যোগী ভক্ত, সকলেই। জ্ঞানপথের লোক তাঁকে বলে ব্রহ্ম। যোগীরা বলে পরমাত্মা। ভক্তেরা বলে ভগবান।

—ঠাকুর সব পথই কি সমান সত্য। আমি জানব কী করে? সুচিত্রা প্রশ্ন করেন রামকৃষ্ণকে। অন্তরে শুনতে পান তাঁর উত্তর।

—একটা পথ দিয়ে ঠিক যেতে পারলে তাঁর কাছে পৌছনো যায়। তখন সব পথের খবর জানতে পারবি। যেমন একবার যদি কোনও উপায়ে ছাদে উঠতে পারিস, কাঠের সিঁড়ি দিয়েও নামতে পারবি, আবার দড়ি দিয়েও নামতে পারবি। তাঁর কৃপা হলে সব জানতে পারবি। একবার যে সে করে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করে আয়, আলাপ করে আয়, তখন দেখবি বাবুই বলে দেবে তাঁর কথানা বাগান, কথানা পুকুর, কোম্পানির কাগজ।

—কিন্তু কী করে তাঁর কৃপা হবে? রামকৃষ্ণকে সুচিত্রা না জিজ্ঞেস করে পারেন না। তাঁকে যে সব জানতে হবেই। ভিতরে-ভিতরে তৈরি হতে হবে মুক্তির পরমলগ্নের জন্য।

—মনে মনে সব কাজের মধ্যেও তাঁর নামগুণ কীর্তন কর। জানি, তুই সর্বদা বিষয় চিন্তার মধ্যে আছিস, চাষ করার জন্যে খেতে অনেক কষ্টে জল এনেছিস। কিন্তু বিষয় চিন্তা হল আলের গর্ত, ঘোগের মতো। ওখান দিয়ে সব জল বেরিয়ে যাচ্ছে। নালা কেটে জল আনা তা-ই পঞ্চম হল। কিন্তু তোর তো মা চিঞ্চুকি হয়েছে। দেখবি আন্তে-আন্তে বিষয়াশকি চলে যাবে। ব্যাকুলতা আসবে। টেলিফোফের তারের মধ্যে অন্য জিনিস মিশাল থাকলে বা ফুটো থাকলে তারের খবর পৌছবে না। তোর মধ্যে ব্যাকুলতা এলে তোর প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে পৌছবে।

—ব্যাকুলতা মানে কী ঠাকুর? ঈশ্বরের জন্যে কতটা ব্যাকুল হতে হয়? সেই ব্যাকুলতা কি আমার মধ্যে দেখা দেবে? জানতে চান সুচিত্রা।

—ব্যাকুল হতে গেলে একলা হতে হয়। নিজেকে সব কিছু থেকে ছাড়িয়ে নিতে হয়। শুধু ঈশ্বরের জন্য কাঁদতে হয়। একলা হওয়া মানে শুধু মানুষ, বন্ধুবান্ধব সংসার থেকে একলা হওয়া নয় রে। কামনা-বাসনা থেকে একলা হওয়া। কোনও কামনা-বাসনা রাখতে নেই। কামনা-বাসনা থাকলে সকাম ভক্তি বলে। নিকাম ভক্তিকে বলে অহেতুকী ভক্তি। তুমি ভালবাস আর নাই বাস, তবু তোমাকে ভালবাস। এর নাম অহেতুকী।

—এমন অহেতুকী ভালবাসের কেমন টান, কেমন ব্যাকুলতা আসে ঠাকুর? সুচিত্রার এ-প্রশ্নের একটি কথায় উত্তর দেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

—সতীর পতির উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান, বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান—এই তিন টান যদি একত্র হয়, তাহলে ঈশ্বর দর্শন হয়।

—ঠাকুর, এই ব্যাকুলতা আমার কী করে আসবে? আমি তো রাতদিন শুধু কাজ নিয়ে ব্যস্ত। একলা হওয়ার সময় কোথায় আমার?

প্রশ্ন করেন সুচিত্রা। উত্তর দেন রামকৃষ্ণ।

—শিবপুজো করতে গেলে অনেক কাজ করতে হয়। ফুল তোলা, চন্দন ঘষা, ঠাকুরের বাসন মাজা, ঠাকুরের জলখাবার সাজানো, সবই পুজোর কাজ। তুই যে কাজ করছিস তা আসলে ওই ফুল তোলা, চন্দন ঘষার মতো। মনটা ঈশ্বরের কাছে ফেলে রাখ। বাড়ির বি কাজ করতে এসেছে। বাসন মাজছে। কিন্তু মন পড়ে আছে বাসায় ফেলে আসা শিশুটির কাছে। তার কথাই ভাবছে বাসন মাজতে-মাজতে। ওইভাবে মনটাকে ফেলে রাখ ঈশ্বর চিন্তায়। হীন বুদ্ধি রাগ হিংসা এসব চলে যাবে। দুই জায়ে যখন কথাবার্তা কইবে, তখন ঠাকুরদেরই কথাবার্তা কইবে। কোনও রকমে ঈশ্বরের সঙ্গে মনের যোগ স্থাপন কর। একবারও তাঁকে ভুলবি না। সব

কাজের মধ্যে তাঁকে মনে রাখবি। তেলের ধারা দেখেছিস? নামতেই থাকে। ভিতরে কোনও ফাঁক নেই। তেমনিভাবে ইশ্বরকে ভাববি। যোগাযোগে যেন মুহূর্তের ফাঁক না থাকে।

—তেলের ধারার মতো ফাঁকফোকরহীন ইশ্বরচিত্ত! সে তো অসম্ভব আমার পক্ষে। ঠাকুরঘর থেকে বেরোলেই তো আমি সব ভুলে যাই ঠাকুর। সুচিত্রার প্রার্থনায় ফুটে ওঠে আর্তি। আশ্বাস দেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

—ভোগ আর কর্ম শেষ না হলে ব্যাকুলতা আসে না। নারদ রামকে বললেন, রাম! তুমি অযোধ্যায় বসে রইলে রাবণবধ কেমন করে হবে? তুমি যে সেই জন্য অবতীর্ণ হয়েছ। রাম বললেন, নারদ, সময় হোক, রাবণের কর্মক্ষয় হোক, তবে তার বধের উদ্যোগ করব। তোরও জীবনে দেখবি, একদিন সময় আসবে, সব দড়িকাছি ছিঁড়ে যাবে, একলা হবি তুই অন্তরের ব্যাকুলতায়, ইশ্বরের কৃপায় তোর জীবনে আসবে সেই পরমলগ্ন। তোর যে এখন মনে হয় এ-সংসারের তুই কেউ নয়, এটা ভাল। এই অবিদ্যার সংসারে তুই বিদেশিনী, তুই বিরহিনী। তুই একদিন সম্পূর্ণভাবে ইশ্বরের শরণাগত হবি। সেদিন জানবি তোর জীবন ভয় নেই। তিনিই তোকে রক্ষা করবেন।

—এ-সংসারে এত দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা কেন ঠাকুর? নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা কোনও দিন ঠাকুরকে শুখ ফুটে বলতে পারেন না সুচিত্রা। আজ এইভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

—এ-সংসার তাঁর লীলা। খেলার মতো। এই লীলায় সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, জ্ঞান-অজ্ঞান, ভাল-মন্দ, কান্না-আনন্দ সব আছে। দুঃখ পাপ এসব গেলে লীলা চলে না। চোর-চোর খেলায় বুড়িকে ছুঁতে হয়। খেলার গোড়াতেই বুড়ি ছুঁলে বুড়ি সন্তুষ্ট হয় না। বুড়ির ইচ্ছে যে খেলাটা খানিকক্ষণ চলে। খেলা চলতে-চলতে ইশ্বর দর্শন করে দু'-একজন মুক্ত হয়ে যায়। অনেক তপস্যার পর, তাঁর কৃপায়। তখন মা আনন্দে হাততালি দেন, ‘ভোকাটা’ এই বলে।

—বেশ তো, তিনি না হয় খেলছেন। তাঁর লীলা চলছে। কিন্তু আমরা যে এত কষ্ট পাচ্ছি। ইশ্বর এত নিষ্ঠুর হলেন কী করে? সুচিত্রার প্রশ্নের উত্তরে আলো জুলে উঠল তাঁর মনের মধ্যে। শুনতে পেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কঠি।

—এই যে বলছিস, ‘আমরা’, আমরা কে? ইশ্বরই সব হয়ে রয়েছেন। মায়া, জীব, জগৎ চতুর্বিংশতি-তত্ত্ব। সাপ হয়ে থাই। আবার ঝোজা হয়ে ঝাড়ি। তিনি বিদ্যা অবিদ্যা দুই হয়ে রয়েছে। অবিদ্যা-মায়ায় অজ্ঞান হয়ে

রয়েছেন। সেই অবিদ্যা-মায়ার মধ্যে তুই কষ্ট পাচ্ছিস। তোর মনে হচ্ছে তুই যন্ত্রণা পাচ্ছিস। আবার বিদ্যা-মায়ার শুরুরপে রোজা হয়ে ঝাড়ছেন, তোর কষ্ট লাঘব করছেন তিনিই। অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান। জ্ঞানী দেখেন তিনিই আছেন। তিনিই কর্তা, সৃষ্টি স্থিতি সংহার করছেন। বিজ্ঞানী দেখেন, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। মহাভাব, প্রেম প্রাণে এলে দেখবি তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই! ভাবের কাছে ভক্তি ফিকে, ভাব পাকলে মহাভাব, প্রেম। তখন শুধুই আনন্দ। আর কোথাও কোনও দুঃখ যন্ত্রণা কষ্ট নেই। তবে মজার কথা কী জানিস, এত দুঃখ কষ্ট সংসারে, তবু মানুষ অবস্থাকেই বস্তু বলে ভাবে। তুই একদিন বুঝতে পারবি, সৈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্থা। সেদিন তোর আর দুঃখ কষ্ট থাকবে না। কাঁটা ঘাস খেয়ে উটের মুখে দরদর করে রক্ত পড়ে। তবু আবার কাঁটা ঘাস খায়। প্রসববেদনার সময় মেয়েরা বলে, ওগো আর স্বামীর কাছে যাব না। আবার ভুলে যায়। তবে, বেশি বিচার করবি না। মা'র পাদপদ্মে ভক্তি থাকলেই হল। বেশি বিচার করতে গেলে, বেশি প্রশ্নের উত্তর জানতে গেলে সব গুলিয়ে যায়। দেশে পুরুষের জল ওপর-ওপর খাও বেশ পরিষ্কার জল পাবে। বেশি নিচে হাত হিঁজে নাড়লে জল ঘুলিয়ে যায়। তাই মায়ের কাছে ভক্তি প্রার্থনা কর। সরকাম ভক্তি নয়। অহেতুকী ভক্তি। ধ্রুবর ভক্তি সকাম। রাজ্যলাভের জন্য তপস্যা করেছিলেন। প্রহাদের ভক্তি অহেতুকী। নিষ্কাম ভক্তি। শ্রীই ভক্তিই তোকে পথ দেখাবে। তুই অন্য জগতের খোঁজ পাবি। তখন দেখবি এই জগৎ থেকে তুই আলাদা হয়ে গেছিস। একা হয়ে যাবি। লোকে ভাববে, এ কেমন জীবন? একা থাকে কী করে? সবাই তোকে বুঝবে না। তোর কী এসে যায় তাতে। তখন তো আলো দেখেছিস। থাকবি অন্য এক আনন্দের মধ্যে। সেই আনন্দের স্বাদ এখন জানিস না। কখনও ভাববি না তোর হবে না। যে বলে আমার হবে না তার হয় না। মুক্ত-অভিমানী মুক্তই হয়। আর বন্ধ-অভিমানী বন্ধই হয়। জোর করে বলবি আমি মুক্ত হয়েছি। সব কাজের মধ্যে এই কথাটাই বলবি। এটাই তোর ধীজমন্ত্র। দেখবি মুক্ত হয়েছিস। যে-রাতদিন আমি বন্ধ, আমি বন্ধ বলে সে বন্ধই হয়ে যায়। আমি জানি, তোর মনে ভয় আছে। ভাবছিস যে-কাজ করছিস তার মধ্যে লোভ-কামের গন্ধ আছে। সে-গন্ধ কি ধুলে যাবে? গিরিশ একদিন বলল, ও হল রসুনের গোলা বাটি। যতই ধোও গন্ধ একেবারে যাবে না। আগুন জুললে গন্ধফন্দ পালিয়ে যায়। রসুনের বাটি পুড়িয়ে নিলে আর গন্ধ থাকে না। নতুন বাটি হয়ে যায়। তোকে মা-ই অনেক দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে পুড়িয়ে নেবেন। দেখবি সেই নতুন বাটিতে আর রসুনের গন্ধ নেই।

আর বেশি কাজ নয়। বছরে একটা কি দুটো ছবি। চিত্রনাট্য খুব ভাল লাগলে তবেই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর। এবার ধীরে-ধীরে গুটিয়ে নেবার পালা। পিছন ফিরে তাকালে একের পর এক হিট ছবি। শুরু ১৯৫৩-র সাড়ে চূয়ান্তর থেকে। ওই একই বছরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। পরের বছর নটা ছবি। তার মধ্যে হিট ওরা থাকে ওধারে, চুলি, সদানন্দের মেলা, অনন্পূর্ণার মন্দির, গৃহপ্রবেশ আর সুপারহিট অগ্নিপরীক্ষা। ১৯৫৫-তে আরও পাঁচটা ছবি। তার মধ্যে শাপমোচন এবং সবার উপরে। ১৯৫৬-তে ছটা ছবি, যার মধ্যে সাগরিকা, একটি রাত, দ্বিযামা, শিঙ্গী। ১৯৫৭-তে তো চারটে ছবিই সুপারহিট : হারানো সুর, চন্দ্রনাথ, পথে হল দেরি, জীবন তৃষ্ণা। পরের বছর তিনটে ছবি, তিনটেই খুব জনপ্রিয় হল, রাজলঙ্ঘী ও শ্রীকান্ত, ইন্দ্রাণী, সূর্যতোরণ। ১৯৫৯-এ দুটো ছবি, দুটোই রমরম করে চলল, চাওয়া পাওয়া, দীপ জ্বলে যাই। ১৯৬০-এ হসপিটাল আর প্রতিটুকু থাক। ১৯৬১ সালে সুচিত্রা জেদ ধরলেন, একটির বেশি ছাঞ্জি কিছুতেই নয়। সে-ছবির নাম সংগৃহী। পরের বছরেও একটি ছাঞ্জি, বিপাশা। আর কিছু প্রমাণ করার নেই, সুচিত্রার। ১৯৫৩ থেকে ১৯৬২, ছবির সংখ্যা উনচল্লিশ, দুটি ছবি বাদ দিলে সব ছবিরই নায়িকা ছাঞ্জি, এবং প্রায় সব ছবিই হিট। সুচিত্রা সেন কোনও ব্যক্তির নাম নয় আর। একটি যুগের নাম। যে-যুগের তিনিই একমাত্র রোম্যান্টিক হিরোইন, মহানয়িকা। তাঁর ধারে কাছে কেউ নেই। বাকিটুকু তো ইতিহাস। যতদিন বাংলা সিনেমা থাকবে, তিনি থাকবেন, সুচিত্রা নিশ্চিত।

কিন্তু শান্তি কোথায়? এত নামডাক, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, বৈভব, এমন তুমুল জনপ্রিয়তা, অথচ বাড়িতে কোনও শান্তি, কোনও সুখ নেই। বাড়ি ফিরতেই ইচ্ছা করে না সুচিত্রার। দিবানাথের সঙ্গে সম্পর্কটা এমন জায়গায় এসে পৌছেছে যে আর এক সঙ্গে থাকা যায় না। দু'জনের পক্ষেই ক্ষতিকর হচ্ছে এই অশান্তিময় সহবাস।

সাত পাকে বাঁধার শুটিং চলছে। পরিচালক অজয় কর। পাশাপাশি আরও একটা ছবিরও শুটিং। ছবির নাম, উত্তর ফাল্গুনী। পরিচালক অসিত সেন। একই সঙ্গে অজয় কর আর অসিত সেনের মতো পরিচালকের সঙ্গে কাজ। তার উপর আবার উত্তর ফাল্গুনীর দুই নায়িকা, মা ও মেয়ে। দুটি ভূমিকাতেই সুচিত্রা। আর কোনও ছবিতে সই করেননি তিনি। প্রযোজকরা

প্রচুর পেড়াপিড়ি করেছেন, কিন্তু সুচিত্রা সেন অনড় তাঁর সিদ্ধান্তে। তিনি জানেন সাত পাকে বাঁধা আর উত্তর ফাল্লুনী তাঁর অন্যতম কীর্তি হয়ে থাকবে—এ দুটি ছবিতে তিনি নিংড়ে দেবেন তাঁর প্রতিভার আর আবেদনের নির্যাস। হয়তো তাঁর ব্যক্তিগত বেদনাও। শুধু যদি বাড়িতে একটু শান্তি পেতাম, যদি সারাদিন কাজের পরে বাড়ি ফিরে নিশ্চিন্তে শুধু নিজের সঙ্গে থাকতে পারতাম, আরও কত ভাল হত আমার কাজ, ভাবেন সুচিত্রা।

—উত্তর ফাল্লুনীর মতো ছবি তুমি প্রয়োজনা করছ, অথচ আমার বস্তু, আমার প্রেমিক ব্যারিস্টারের রোলটা তুমি নিজে কেন করলে না উত্তু? তুমি ওই রকম একটা দারুণ রোলে নিজে না করে বিকাশ রায়কে দিলে! উত্তমকে একদিন জিজেস করলেন সুচিত্রা।

—কেন দিয়েছি পরে বুবাবে। বিকাশদার মতো একজন অভিনেতা বাংলা সিনেমায় আর কোথায়?

—উত্তম সুচিত্রা আর উত্তম বিকাশ এক হল? ব্যারিস্টারের রোলে তোমাকে কী দারুণ মানাত বল!

—বিকাশদা টেরিফিক। সুচিত্রা-বিকাশের এ-ছবি সুপারহিট হবেই। সূর্যতোরণে আমি যদিও নায়ক, বিকাশদা কিন্তু তোমাকে বিয়ে করতে চাইছেন! আমার বিপরীতে থাকে কুশল অ্যান্টিহিরো, রাইভাল। প্রায় সমান-সমান। তিনিও এক রকম নাহিনে মনে আছে? কী ব্রিলিয়ান্ট অভিনয়!

—মনে আছে।

সাত পাকে বাঁধার নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সৌমিত্রের সঙ্গে সুচিত্রা এই প্রথম। সৌমিত্রের অভিনয়-ধরন একেবারেই উত্তমের মতো নয়। রোম্যান্টিক দৃশ্যে বেশ অন্য রকম। সুচিত্রার মন্দ লাগে না এই নতুন স্টাইল। কিন্তু মানুষটাকে আরও ভাল লাগে সুচিত্রার। খুব অন্দু। ভিতরে-ভিতরে কোথাও একটা লেখাপড়ার অহংকার আছে, মনে হয় সুচিত্রার। যদি কেউ উত্তমকুমারের পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে, নিয়ে আসতে পারে অন্য রকম অভিনয়-ভঙ্গির মৌলিকতা, তা হলে সে সৌমিত্র। বেশ লাগে তাঁর। এই সুদর্শন বুদ্ধিমান নায়কটির সঙ্গে আড়ত দিতে। একটু-আধটু ফ্লার্টিং-এ সাড়া দেয় এই যুবক। রসবোধ প্রকট।

সাত পাকে বাঁধার শুটিং সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। সুচিত্রার জীবনে আর কিছু নেই। শুধু কাজ আর কাজ। তুই কাজ করছিস না। সব কাজ মা-ই করছেন। তোর কাজের মধ্যে দিয়ে মা নিজেকে প্রকাশ করছেন। কাজের মধ্যে দিয়েই তোর মুক্তি আসবে। ঠাকুরের কথা মনে পড়ে সুচিত্রার।

ভোরবেলা স্নান সেরে ঠাকুরঘরে রামকৃষ্ণকে প্রণাম করেন। তার পর যাত্রা করেন স্টুডিয়োর পথে। প্রতি রাতেই দিবানাথের সঙ্গে খিটিমিটি। কিন্তু সুচিত্রা কাজে বেরোবার সময় ভুলে থাকতে চান সেই যন্ত্রণা।

—ভোরাতে বাড়ি ফিরেই আবার সাতসকালে কাজ? স্টুডিয়োতেই থাকলে পার। সিঁড়ির মুখে আচমকা দিবানাথ। আজ তাঁর তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙেছে।

সুচিত্রায় মাথায় হঠাৎ রক্ত চড়ে গেল। রংগের মধ্যে দপদপ করতে লাগল। শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। মনে হল, মাথা ঘুরে সিঁড়ি দিয়ে পড়ে যাবেন। মনে হল, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। মনে হল, দিবানাথের গায়ের পাঞ্জাবিটা ফালা-ফালা করে ছিঁড়ে ফেলে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে পারলে ভাল হত। হয়তো উজ্জেব্বলাটা একটু কমত। সুচিত্রা প্রতিবাদে কোনও কথাই বললেন না। নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাড়িতে বসলেন।

মেকআপ নিয়ে সুচিত্রা যখন ক্যামেরার সমনে দাঁড়ালেন তখনও তিনি যেন নিজের মধ্যে নেই। নিজেকে তাঁর মনে হল অন্য কেউ। আপনার কি শরীর খারাপ? জিজ্ঞেস করলেন পরিচালক অজয় কর। না, না, একেবারে ঠিক আছি। নো প্রবলেম, বললেন সুচিত্রা। আজ শ্যটিংয়ের শুরুতেই স্বামীর ভূমিকায় সৌমিত্রি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রবল বিবাদের দৃশ্য। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে চিরকালের জন্য। সুচিত্রার হঠাৎ মনে হল সৌমিত্রির জায়গায় দিবানাথ দাঁড়িয়ে। মনের উপর তাঁর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। তাঁর রংগের মধ্যে আবার দপদপ করে উঠল ক্রোধ।

স্টার্ট ক্যামেরা, বললেন পরিচালক। তুঙ্গে উঠল স্বামী-স্ত্রীর কলহ। সুচিত্রা এগিয়ে গেলেন সৌমিত্রির কাছে। তীব্র আবেগে ছিঁড়ে ফেললেন তাঁর বুকের পাঞ্জাবি। কাট, বললেন অজয় কর। সবাই স্তুতি। মুঝ দৃষ্টিতে অজয় কর তাকিয়ে সুচিত্রার দিকে। সৌমিত্রিও মুঝ। সেই সঙ্গে কিছুটা অপ্রস্তুত। সুচিত্রার চোখে জল। খুব বাড়াবাঢ়ি করে ফেললাম, না? আবার নেবেন দৃশ্যটা? পরিচালকের দিকে তাকিয়ে সুচিত্রার প্রশ্ন। তাঁর গলা তখনও কাঁপছে।

—পাগল হয়েছেন। চিত্রনাট্যে এমন একটা দৃশ্য আমরা ভাবতেই পারিনি। অসামান্য একটা ব্যাপার করলেন আপনি। অভিনয় বলেই তো মনে হচ্ছে না। একেবারেই বাড়াবাঢ়ি নয়। এটাই ন্যাচারাল। এক কথায় অসাধারণ দৃশ্য। বললেন, অজয় কর।

না, আর বালিগঞ্জ প্লেসে থাকা অসম্ভব। দিবানাথের থেকে আলাদা হতেই হবে। কিন্তু আলাদা হওয়ার পথে প্রধান বাধা দুটি। এক দিবানাথ নিজে। তিনি কি বুঝবেন? সুচিত্রাকে দেবেন নিজের মতো বেঁচে থাকার স্বাধীনতা? সেই সঙ্গে নিজের বাকি জীবন নিজের মতো কাটাবার সিদ্ধান্ত নেবেন? সেই মনের জোর কি তাঁর আছে? দুই, বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাবেন সুচিত্রা? মনের মতো নতুন ঠিকানা পাওয়া কি অত সহজ?

সুচিত্রা দিবানাথ শেষ পর্যন্ত পৃথক হলেন। ডিভোর্স নয়। আইনত বিচ্ছেদ নয়। শুধু আলাদা, যে-যাঁর মতো থাকার ব্যবস্থায় সায় দিলেন দিবানাথ। সুচিত্রা তাঁর নতুন ঠিকানা খুঁজে পেলেন ম্যুর অ্যাভিনিউ-তে। সেখানে মন বসল না। বাড়ি বদলে এলেন নিউ আলিপুরে। সেখানেও ভাল লাগছে না তাঁর। তিনি চান এমন একটি বাড়ি যেখানে পাবনার সেই লাল বাড়ির মতো থাকবে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। হঠাতে কানে এল এই সুসংবাদ যে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শচীন চৌধুরিকে তাঁর ৫২/৪/১, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িটা বিক্রি করতে চান। সুচিত্রা দেখতে গেলেন সেই বাড়ি। এ তো তাঁর স্বপ্নের বাড়ি। মুক্ত বড় লন, আর গাছপালায় ঘেরা এক অঞ্চলিকা। পরম বক্ষ অসিত চৌধুরিকে সুচিত্রা বললেন, বাড়িটা এখনি কিনতে চান তিনি, অসিত চৌধুরি মধ্যস্থতা করেন। তা-ই করলেন অসিত চৌধুরি। প্রায় রাতারাতি বাড়িটি সুচিত্রা সেনের হয়ে গেল। মনের মতো সেই স্বপ্নপুরী সাজালেন সুচিত্রা।

সুচিত্রার প্রথম লক্ষ্য, বাড়ি যেন ফার্নিচারের দোকান না হয়ে ওঠে। যেন অনেকটা ফাঁকা জায়গা থাকে বাড়ির মধ্যে। পাঁচখানা বড়-বড় ঘর। এক-একটা ঘর যেন দালানের মতো বড়। একটি ঘর অতিথি আপ্যায়নের জন্য। যাকে বলে বৈঠকখানা। ঝাড়লঠন পছন্দ করেন সুচিত্রা। উচু সিলিং থেকে ঝুলিয়ে দিলেন ঝাড়বাতি। ঝলমল করে উঠল ড্রয়িংরুম। ড্রয়িংরুমের পাশেই খাবার ঘর। খাবার ঘর আর রান্নাঘর পাশাপাশি। আয়তনে দুটি পরস্পরের প্রতিযোগী। একটু দূরে সুচিত্রার মজলিস মহল। স্রেফ আড়া দেওয়ার ঘর। সুচিত্রা বিরাট একটি পালঙ্ক রাখলেন সেই ঘরে। টাঙ্গালেন একটি মনোরম দোলনা। পাশের ঘর মুনমুনের। আর মুনমুনের ঘরের পাশেই সুচিত্রার নিজের ঘর। বিশাল ঘর দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সমান। এই ঘরেরই অঙ্গ সুচিত্রার ঠাকুরঘর। ঠাকুরঘর জুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি। সুচিত্রার শোওয়ার ঘরে বড়-বড় জানলায় উঠে এসেছে নিচের বাগান থেকে গাছের ডাল। জানলা খুললেই ফল-ফুলের

গন্ধ। ঘরের কোণে বিরাট পালক। কিন্তু সেখানে কেউ শোয় না। সেটি শুধু সাজানো আছে। রামকৃষ্ণের ছবির সামনে সুচিত্রার এক চিলতে নিচু খাট। তোশক পর্যন্ত নেই। কাঠের পাটাতনের উপর চাদর পাতা। মাথার কাছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। সুচিত্রার শোওয়ার ঘরে চুকলে মনে হয় এ-বাড়িতে বিলাস শুধু উপরের ঢাকনা। সুচিত্রা ভিতরে-ভিতরে ইতিমধ্যেই বেছে নিয়েছেন বর্জনের, কৃচ্ছসাধনের পথ। এই ঘরগুলি ছাড়াও রয়েছে একটি লম্বা চওড়া কার্পেটমোড়া বারান্দা। বারান্দার একটি দিক চিক দিয়ে ঢাকা। চিক সরালে চোখে পড়ে নিচে মোরামের পথ, সবুজ বাগান এবং এক ধারে সুচিত্রা সেনের গাড়ির সারি। এত বড় বাড়িতে সুচিত্রা একা থাকবেন কী করে? মুন্মুনকে অবিলম্বে নিজের কাছে নিয়ে এলেন সুচিত্রা। ভর্তি করে দিলেন লোরেটো স্কুলে।

শোওয়ার ঘর আর ঠাকুরঘর পাশাপাশি। এইভাবে সুচিত্রার জীবনের সঙ্গে মিশে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ভোরবেলা ঘৰ ভাঙলে তাঁর চোখ পড়ে রামকৃষ্ণের ছবির উপর। স্নান সেরে গিয়ে তিসেন রামকৃষ্ণের কাছে। তাঁকে জানান তাঁর সব সুখদুঃখের কথা। রামকৃষ্ণই সুচিত্রার একমাত্র বন্ধু, একমাত্র আত্মীয়, একমাত্র আশ্রয়।

—এখনও সংশয়, এখনও কষ্ট, এখনও উদ্বেগ, অশান্তি।

—কেন শান্তি পাচ্ছি চি? ঠাকুর? ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে সুচিত্রার প্রার্থনার সঙ্গে মিশে যায় প্রশ্ন। তিনি হৃদয়ের গহনে অনুভব করেন রামকৃষ্ণের উত্তর।

—তোকে আগেই বলেছি মা-ই একদিন তোকে পুড়িয়ে একেবারে শুন্দি করে নেবেন। সেদিন থেকে তোর সব অশান্তি দূর হবে।

—সেদিন আর কত দূরে ঠাকুর?

—অপেক্ষা কর। বেশি দেরি নেই।

শান্তি পেলেন না দিবানাথ। বাড়িতে তাঁর মন বসল না আর। শিশিৎ কর্পোরেশন-এ চাকরি নিয়ে ক্রমাগত সমুদ্রে ভাসতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌছলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। দিবানাথের কাছ থেকে আলাদা হয়েছেন বটে, কিন্তু ওই বেপরোয়া ভবযুরে মানুষটির জন্য দুঃস্থিতাও হয় সুচিত্রার। কেমন যেন ভয়-ভয় করে। ১৯৬৯-এর ২৮ নভেম্বর ঘুম এল না সুচিত্রার চোখে। ঠাকুরঘরে কাটল তাঁর সারারাত। মনে হল, ঝড় আসছে। এই ঝড়ে ভেঙে যাবে তাঁর সব জানলা-দরজা। উড়ে যাবে সব বন্ধন। তা হলে কি

তিনি এবার মুক্ত হবেন? মুক্তি মানে তো আনন্দ। কিন্তু তা হলে মনে কেন ঘনিয়ে এল এমন অশান্তি আর ভয়?

২৯ নভেম্বর ভোররাত। টেলিফোনে এল সেই মর্মান্তিক সংবাদ। মুনমুনই ফোনটা ধরল। আকস্মিক দুর্ঘটনায় আমেরিকায় মারা গেছেন দিবানাথ। সুচিত্রা বোবেন, তাঁকে সংযত থাকতেই হবে। মুনমুনের মুখ চেয়ে তাঁকে স্বাভাবিক জীবন থেকে একচুল সরে গেলে চলবে না। তা হলে মুনমুন নিজেকে সামলাতে পারবে না।

তখন মেঘ কালো ছবির শৃঙ্খিং চলছে। পরিচালক সুশীল মুখোপাধ্যায়কে সুচিত্রা ফোনে জানালেন, শৃঙ্খিং যেমন চলছে তেমনই চলবে। ছবির নায়ক বসন্ত টোবুরি হত্তবাক সুচিত্রা সেনের এই সিদ্ধান্তে।

—মুন, তুই কি চাস বড়ি কলকাতায় আনা হোক?

সুচিত্রার প্রশ্নে ঘাড় নাড়ল মুনমুন।

চার্টাড ফ্লাইটে বড়ি আনার সব ব্যবস্থা করলেন সুচিত্রা। সাহায্য করলেন সব রকম ভাবে কলকাতা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যে সুচিত্রা সেনের মৃত্যু।

দীর্ঘ বাইশ বছরের যন্ত্রণাময় অস্পত্য জীবনের অবসান ঘটেছে। কিন্তু সুচিত্রার জীবনে কোথায় শক্তি? এখনও ভয়, এখনও মানসিক যন্ত্রণা। দিবানাথের মৃত্যুর পর থেকে রবীন্দ্রনাথের একটি গান শুনগুন করে সুচিত্রার মনে। সব যে হয়ে গেল কালো, নিবে গেল দীপের আলো, আকাশ পানে হাত বাঢ়ালেম কাহার তরে? গানের ওই কথাগুলি বারবার গান সুচিত্রা : সকাল বেলায় চেয়ে দেখি, দাঁড়িয়ে আছ তুমি একি, ঘর-ভরা মোর শূন্যতারই বুকের 'পরে।

অর্থ চারধার তো খাঁ-খাঁ করছে। কোথায় দাঁড়িয়ে আছ তুমি এই শূন্যতার বুকে? দেখতে পাব কী করে? সত্যিই কি তোমার ঘাড় একদিন জয়ধ্বজা হয়ে উড়বে আমার জীবনে? সুচিত্রার মন থেকে প্রশ্ন ও সংশয় কিছুতেই কাটে না।

দেখতে-দেখতে তিনি বছর কেটে গেছে। সুচিত্রার মনে পড়ে দিবানাথকে। আর কোনও রাগ-অভিমান নেই তাঁর। আলো আমার আলো ছবির শৃঙ্খিং চলছে। নায়ক উত্তম। পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায়। হঠাৎ স্টুডিয়োতে স্ট্রাইক। ক'দিনের ছুটি পাওয়া গেল। এই অবসরে একবার বেনারস যাওয়া যায় না? সুচিত্রা মনের ইচ্ছে প্রকাশ করলেন পিনাকী মুখোপাধ্যায়ের কাছে।

গাড়িতে বেনারস যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিলেন অসিত চৌধুরি। বেনারস থেকে গয়ায় গেলেন সুচিত্রা। স্বামীর পিও দিলেন সেখানে। তারপর রাজগির হয়ে যখন কলকাতায় ফিরলেন, তখন যেন অন্য মানুষ তিনি। সব কিছুর মধ্যে থেকেও কোনও কিছুর মধ্যে নেই। রমা যে অন্য মানুষ, উধাও, উদাস, অনুভব করলেন উত্তমকুমার। কাজের মধ্যেও অমনক্ষ, উন্মান হয়ে যান সুচিত্রা। উত্তম নিজেকে দূরে রাখেন, সুচিত্রাকে একা থাকতে দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে মনে-মনে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেও সুচিত্রা অনুভব করলেন তাঁর জীবনে গুরুর অভাব ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে। এক গভীর রাতে সুচিত্রার স্বপ্ন আলো করে এলেন চৈতন্যদেব। বিষ্ণুপ্রিয়া বলে ডাকলেন তাঁকে। কী মায়াময় সেই ডাক, অন্য যুগ থেকে আসা সেই কঠস্বর। তাঁর বাণী স্পষ্ট শুনতে পেলেন সুচিত্রা, ভগবানই আমাদের মাথায় বেঁধে রেখেছেন, আবার তিনিই হয়ে উঠছেন মুক্তির কারণ। গুরু কিন্তু শুধু মুক্তির পথ বলে দেন, বলে দেন কোন পথে মায়ার বন্ধন কেটে মোক্ষ আসবে। তা-ই গুরু ছাড়া পথ খুঁজে পাচ্ছেন তুমি। সুচিত্রা স্বপ্নের মধ্যে প্রশ্ন করলেন চৈতন্যদেবকে, কে আশ্রয় দেবেন গুরুর সঙ্গান? কোথায় পাব তাঁকে? চৈতন্যদেবের উত্তর হলেন সুচিত্রা, ইশ্বরই দেখাবেন পথ, চেনাবেন গুরুকে। তুমি শক্তিশালী হলে গুরু তোমাকে নিজের করে নেবেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদ আমাদের জানাচ্ছে, গুরু ছাড়া মুক্তির উপায় নেই। আলোর দিশারি হলেন গুরু। বিষ্ণুপ্রিয়া, তুমি বীজমন্ত্রের জন্য ব্যাকুল। গুরু শব্দটাই তো বীজমন্ত্র। বড় আশ্চর্যের ব্যাপার সরস্বতীর বীজমন্ত্র, কৃত্তলিনীর বীজমন্ত্র আর গুরুর বীজমন্ত্রে কোনও প্রভেদ নেই। সেই মহাগোপন বীজমন্ত্র হল ‘ঞ্চঁ’। মনে রেখো বিষ্ণুপ্রিয়া, ‘গুরু’ শব্দটিও বীজ। ‘গু’ অর্থাৎ তিমির। ‘রু’ অর্থাৎ দৃতি। যার দৃতি তিমির নাশ করে তিনিই ‘গুরু’। স্বপ্নের মধ্যে এইভাবে বীজমন্ত্র পেলেন সুচিত্রা, দীক্ষিত হলেন নবচৈতন্যের আলোয়। রামকৃষ্ণ তাঁকে পথ দেখালেন—দক্ষিণশ্রেণের পথ। সুচিত্রা ভরত মহারাজের শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করলেন, আমার সব ভালমন্দের ভার আপনার, আপনি পথ দেখান, যে-পথে সব অঙ্ককার দূর হবে, যে-পথে সেই আলোর, সেই আনন্দের দেখা পাব, আমি যার জন্যে কতকাল অপেক্ষা করছি। ভরত মহারাজ সুচিত্রার মাথায় হাত রাখলেন। সুচিত্রার মনে হল চৈতন্যদেব এঁর কথাই যেন বলে গেছেন, সকল অঙ্ককার দূর হল গুরুর আলোয়।

৯

লাঞ্চ ব্রেক। শুনশান দুপুর। সুচিত্রা কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই বললেন উত্তমকুমারকে, তোর সঙ্গে কিছু কথা আছে উত্ত, চ' বসি আমাদের পুরুরধারে। অনেক দিন বসিনি সেখানে। সুচিত্রা আজকাল ‘তুই’ বলেন উত্তমকুমারকে। আরও যেন মধুর হয়েছে ওঁদের সম্পর্ক। ‘তুই’ বলে উত্তুকে আরও কাছে ডেকে নিয়েছেন সুচিত্রা।

পুরুরধারে সেই জায়গাটিতে ওঁরা পাশাপাশি বসলেন। একই রকম পরিবেশ। হ-হ বাতাসে পাতা ঝরছে চারপাশে। উত্তমকুমারের হাতে মৃদুভাবে হাত রাখলেন সুচিত্রা।

—উত্ত, তোদের এই জগতে আমি আর বেশিদিন নেই। আমার ডাক এসেছে।

—মানে!

—মানে, আমি অন্য জগতের স্বাদ পেয়েছি উত্ত। সে বড় আনন্দের জগৎ।

—তুই আর অভিনয় করবি না! অভিনয় না করে, ক্যামেরার সামনে না দাঁড়িয়ে থাকতে পারবি? পাগলামি করিসনি।

—পাগলামি নয় রে উত্ত, আমার পক্ষে অভিনয় করা আর সম্ভব নয়। আমি এমন এক আলোর, এমন এক শান্তির সঙ্কান পেয়েছি যার কাছে এসব কিছু মিথ্যে মনে হচ্ছে। জগতে আর কোনও কিছু, কাউকে প্রয়োজন নেই আমার। সব কিছু ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি। একটা কথা মনে রাখিস। প্রিয়বাঙ্কী-ই তোর সঙ্গে আমার শেষ ছবি। আমাদের দীর্ঘ পথের এখানেই শেষ। আমি থেকে গেলাম তোর চিরকালের প্রিয়বাঙ্কী। একটা কথা দিবি?

—কী কথা?

—তুই আমাকে আর ফোন করবি না। কোনও প্রয়োজনে ডাকবি না। কোনও খোঁজ রাখবি না আমার। তুই ফোন করলে হয়তো আমি দুর্বল হয়ে পড়ব। কথা দে, আমার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখবি না।

কোনও কথা বললেন না উত্তম। সুচিত্রা একটু হেসে বললেন, একটা গান শোনবি উত্ত, জীবনে হয়তো তোর গান আর কোনও দিন শোনা হবে না। উত্তম ধরা-ধরা গলায় গাইতে শুরু করলেন,

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই—

ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।

মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই,
 চাহিতে গেলে মরি লাজে ॥
 জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম
 এমন ধন আর নাহি যে তোমা-সম,
 তবু যা ভাঙ্গচোরা ঘরেতে আছে পোরা
 ফেলিয়া দিতে পারি না যে ।

কান্নায় গাঢ় হয়ে গেল উত্তমের কর্ষ্ণ । বাকি গান আর গাইতে পারলেন
 না । সুচিত্রার হাত ধরে শুধু বললেন, তোকে~~কে~~ কী করে থাকব বল তো?

—পারবি । ঠিক পারবি । প্রিয় বাঙ্গালীর জন্যে তোকে পারতেই হবে
 উত্তু । এইটুকু না-পারলে জানব ~~তু~~ আমাকে ভালবাসিস না, কোনওদিন
 ভালবাসিসনি ।

উত্তম চোখ রাখলেন সুচিত্রার চোখে । দীর্ঘক্ষণ । সুচিত্রা চোখ নামিয়ে
 নিলেন না । এই প্রথম তাঁরা পরম্পরের দিকে এইভাবে তাকালেন ।
 দীর্ঘায়িত সেই আঁথিপাতের কোনও শেষ নেই যেন ।

ঋণ—আমার বাল্যবন্ধু : ফুলরানি কাঞ্জিলাল; আমার বন্ধু সুচিত্রা সেন :
 অমিতাভ চৌধুরী; যে জন আছেন নির্জনে : সুমন গুপ্ত; টেলিউডের ঘেটো
 গার্বো : হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়; সুচিত্রার কথা : গোপালকৃষ্ণ রায়; *Suchitra
 Sen : A Legend in her Lifetime : Shoma Chatterjee.*



বাড়িতে পুজোর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত



মেয়ের সঙ্গে খেলা



সপরিবারে সুচিত্রা



‘জীবন তৃষ্ণা’ ছবিতে সুচিত্রা



সুচিত্রা সেন ও মহানায়ক উত্তমকুমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



প্রিয় পোষ্যর সঙ্গে



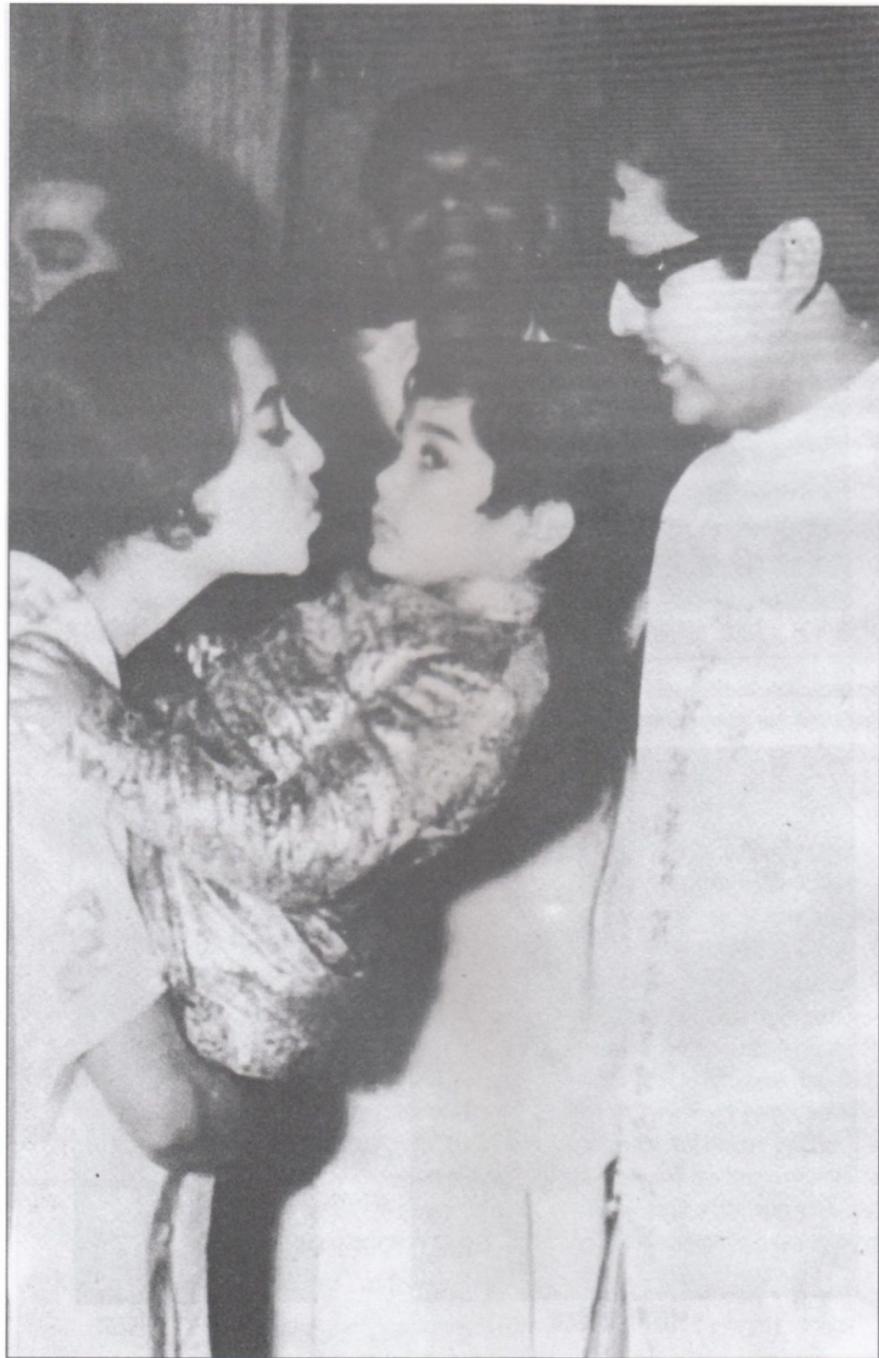
মহানায়িকা



পর্দার বাইরে



ঘরোয়া সুচিত্রা



প্রসেনজিতকে আদর করছেন মহানায়িকা। পাশে বিশ্বজিৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



সাহসিনী



ঘরোয়া সুচিত্রা



সোফায় বসে মহানায়িকা



জলকন্যা সুচিত্রা সেন



সাহসী ফোটোগ্রাফ



সুইমিংসুট পরিহিত সুচিত্রা



অনবদ্য সুচিত্রা সেন

জন্ম-৬ এপ্রিল ১৯৩১ মৃত্যু-১৭ জানুয়ারি ২০১৪

